কাদিয়ানীদের স্বরূপ

মূল

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
শায়খ মুহাম্মদ খিদির হুসাইন

অনুবাদ

হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ

কাদিয়ানীদের স্বরূপ

মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন

অনুঃ হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
বাংলাদেশ।

কাদিয়ানীদের স্বরূপ

প্রকাশকাল ঃ
২০ চৈত্র ১৪০০
২১ শাওয়াল ১৪১৪
৩ এপ্রিল ১৯৯৪

প্রকাশিকা ঃ
বেগম নাঈমা
৪৫৩, শেওড়াপাড়া
মীরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণ ঃ
হক প্রিন্টার্স
১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা।
ফোন-৪১৪০৫৮

মূল্য ঃ ২০.০০

Kadianider Sharup, Written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi & Shaikh Mohammad Khidir Hossain, Translated into Bengali by Hafiz Abul Barakat Mohammad Hizbullah, Published by Begum Naima, Bangladesh

April 1994

উৎসর্গ

যুগে যুগে ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে
সোচ্চার কণ্ঠের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! অবশেষে আল্লাহ পাক অনুবাদটি পুস্তকাকারে প্রকাশের তাওফীক দিলেন। অনুবাদটি তৈরি করেছিলাম পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায়, রওযায়ে আতহারের কেন্দ্রভূমিতে। সময় ১৯৮২ কি ৮৩ সাল। রাবেতা আলমে ইসলামী তার ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাহিত্য প্রচার ও ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধে বিশ্বনন্দিত ইসলামী ব্যক্তিগণের লেখা মূল ও অনুবাদ পুস্তকাকারে বিলি করে থাকে। তারই একটি সংজোযন ছিল কাদিয়ানীদের উপর লেখা তিন মনীষীর তিনটি প্রবন্ধ। তাঁরা হলেন (১) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (২) সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও (৩) শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন। কাদিয়ানী ষড়যন্ত্র ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি ক্যান্সার। এটা উপলব্দি করতে পেরেই বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ইসলামী দেশ অপারেশনের মাধ্যমে এ ক্যান্সার থেকে মুক্তি লাভ করে এবং ঘোষণা করে তারা অমুসলিম। তারা কাফের। ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামী আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচারের ছদ্মাবরণে তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ পেশ করে নিরীহ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে আসছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে তারা আইনতঃ অমুসলিম নয়। এ সুবাদে তারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অপতৎপরতা। চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে দেশের আনাচে কানাচে। দেরীতে হলেও উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত আন্দোলন। সেই আন্দোলনে একাত্ম হয়ে আজ আমিও আন্দোলিত। যেমন আন্দোলিত হয়েছিলাম বিশ্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্বজনীন খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চির নিদ্রাভূমি মাদীনাতুত তাইয়েবায় বসে এ তিনটি প্রবন্ধ পড়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে। কলম হাতে নিয়ে বসেছিলাম অনুবাদে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সে অনুবাদ। যেন তারা জানতে পারেন, এরা কারা? কি চায় ওরা? অনুবাদ শেষ হল বটে কিন্তু ...। দেরীতে হলেও মুদ্রণের কাজে হাত দিতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তুলে দিচ্ছি পাঠকের হাতে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী ও শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইনের প্রবন্ধ। সহযোগিতায় যারা ছিলেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াতের পথে অটল রাখুন। হেফাযত করুন কাদিয়ানীসহ বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী অপশক্তির বিষাক্ত থাবা থেকে। আমীন।

হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ১৩/০১/৯৪ ইং

।। অভিমত ।।

'কাদিয়ানীদের স্বরূপ' বস্তুতঃ উর্দূ ও আরবীতে লিখিত দু'টি প্রবন্ধের একটি অনুবাদ গ্রন্থ। প্রবন্ধ দু'টি লিখেছেন যথাক্রমে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও গবেষক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ও মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন।

প্রবন্ধ দু'টিতে প্রবন্ধকারগণ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, ক্রমবিকাশ ও আকীদা সম্পর্কে তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করেছেন তাঁরা। এ মতবাদের অনুসারীদেরকে কেন বাতিল সম্প্রদায় ও অমুসলিম ঘোষণা করা প্রয়োজন তার উপর রয়েছে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য ও জ্ঞানগর্ভ দলীল। প্রবন্ধ দু'টি পাঠে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবির যৌক্তিকতা খুঁজে পাবেন পাঠকবৃন্দ।

মিসরের প্রাক্তন মুফতী হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে বহুলাংশে। রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বিশ্ব আলেম সমাজের মতামতেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

আরবী, উর্দূসহ অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে প্রবন্ধগুলো। জনাব হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ মাতৃভাষায় প্রবন্ধ দু'টির অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদেরকে কাদিয়ানীদের প্রতারণা ও অপতৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক করার আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছেন। অনুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশ এ মুহূর্তে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুবাদটি বলিষ্ঠ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে বলা যায়, অনুবাদক প্রবন্ধ দু'টি অনুবাদ করে দেশ ও জাতির বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ মতবাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আকীদা সম্পর্কে জানা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ
প্রফেসর ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবেদন

মুসলমান ভাইসব

আমরা আপনাদের খেদমতে এক বাতিল গোষ্ঠী 'কাদিয়ানী'দের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পেশ করছি। প্রবন্ধগুলো (১) ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কয়েকজন সুবিখ্যাত আলেম কেরাম এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী প্রপাগান্ডা সম্পর্কে গভীর পড়াশুনার পর তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন। 'কাদিয়ানী মতবাদ' এমন একটি প্রপাগান্ডা যা অন্যান্য নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী মতবাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী বিশ্বকে ক্ষত বিক্ষত করতে চায়।

আমরা আপনাদের কাছে আশা রাখি যে, এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করবেন। কেননা ঈমানদারদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে অজস্র পূণ্য আর বরকত নিহিত রয়েছে।

আল্লাহর দরবারে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সমগ্র মুসলিম জাতি তথা ইসলামের মঙ্গলের জন্য অধিকতর কাজ করার সুযোগ দান করেন।

মুহাম্মাদ সালেহ কাজ্জাজ
সেক্রেটারীজেনারেল
রাবেতা আলমে ইসলামী

১। ক) কাদিয়ানী মতবাদ ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (ভারত)।
খ) কাদিয়ানী সমস্যা ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (পাকিস্তান)।
গ) কাদিয়ানী সম্প্রদায় ঃ শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন (মিশর)।

ভূমিকা

কাদিয়ানীরা সর্বজন বিদিত সেই সব গোমরাহ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত, যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেই হাদীছে তিনি তাঁর পরে তাঁর উম্মতের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।

ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এ দল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৮ ইংরেজীতে কাদিয়ান নামক এক গ্রামে এ ব্যক্তির জন্ম হয়। সেখানেই সে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। পরে সে ডাক্তারী, মানতিক ও দর্শন বিষয়ে পড়াশুনা করে। এরপর অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরীরত থাকে। যৌবনে একবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। কবিরাজী ও নেশাযুক্ত কিছু জিনিস দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হয়।

প্রথম পর্যায়ে সে এ দাবি করেছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর এক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে- আল্লাহ নাকি তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত মাখলূকের সংশোধন করতে বলেছেন। সে এও দাবি করে যে, তার কিছু ইলহাম ও অলৌকিক ঘটনা রয়েছে এগুলো নাকি তার সাথী কাদিয়ানবাসীরা প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর সে ধীরে ধীরে নানারূপ ভ্রান্ত ও আজগুবি দাবি করতে থাকে।

তার ভ্রান্ত দাবিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। মাসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর আত্মা তার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

২। তার ইল্‌হামসমূহ কুরআনে পাক, তাওরাত এবং ইঞ্জীলের মতই আল্লাহর কালাম।

৩।. শেষ যামানায় "কাদিয়ান" শহরেই মাসীহর অবতরণ হবে।

৪। 'কাদিয়ান'ই হচ্ছে সেই পবিত্র এলাকা যাকে কুরআনে পাকে "মাস্‌জিদে আকসা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা এবং মদীনার পরে এটাই তৃতীয় পবিত্র স্থান।

৫। এই 'কাদিয়ানে' (যা তার কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান) হজ্জ করা ফরয।

৬। তার উপর দশ হাজারেরও বেশি আয়াত ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।

৭। যে একে অস্বীকার করবে সে কাফের।

৮। কুরআনে পাক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ তার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার প্রেরণের সময় কাল এবং কোথায় তার আবির্ভাব হবে সেই জায়গাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ইত্যাদি।

এ হচ্ছে তার দাবি যার ঘোষণা সে করেছে এবং তার রচিত বইসমূহ যেমন 'বারাহীনে আহমাদীয়া' ও 'তাবলীগে রেছালাত' এর দাওয়াত পেশ করেছে।

আমরা এ সম্পর্কে তার বই পড়েছি এবং তাতে যে সকল কুফরী কথাবার্তা বলা হয়েছে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাও পরখ করে দেখেছি। তার অনুসারীরাও এগুলো বিশ্বাস করে এবং এসব আকীদাই তারা পোষণ করে যেগুলো সে সব সময় বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেছে। আসলে মির্যা গোলাম আহমাদের একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের খায়েশ ছিল। এর প্রচার ও তাবলীগ হবে। অনেক লোক তার অনুসারী হবে। তার উপর ঈমান আনবে। এই ধর্ম প্রচারের কাজে তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। আসলে সে ইংরেজদের পদলেহী সেবাদাস ছিল যারা তখন ভারত শাসন করছিল। এজন্যই সে ইংরেজ সরকারের সেবায় কোন রকম কার্পণ্য করেনি। তাই সে লিখছে ঃ

"আমি আমার শৈশব থেকে এ পর্যন্ত যা প্রায় ষাট বছর হবে নিজের বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে এ কাজেই মশগুল ছিলাম যে, সকল মুসলমানের দিল-দিমাগে কিভাবে ইংরেজ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মানো যায়, কিভাবে তাদেরকে ইংরেজদের কল্যাণকামী ও খায়ের খা বানানো যায় এবং কিভাবে তাদের কিছু অবুঝ ও নির্বোধ লোকদের মন থেকে জেহাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায়, যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক থেকে বিরত রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জেহাদে বিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে যাবে। কেননা আমাকে মাসীহ এবং মাহদী মানার অর্থই হচ্ছে জেহাদকে অস্বীকার করা।

সে আরও বলেছে, "ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমি অনেক বই রচনা করেছি। যারা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছে সততার সাথে তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয।

এ প্রকাশ্য ফেৎনা এবং ভ্রান্তি মুসলমানদের হৃদয়ে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতো সব সময়েই হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদের সুতীক্ষ্ণ লিখনী এবং বক্তৃতার মাধ্যমে দৃঢ়তার সংগে এর মোকাবিলা করেন। এদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গোরী (যিনি লাখনৌ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন), মাওলাানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী এবং সুবিখ্যাত ইসলামী কবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কাদিয়ানী মতবাদ নুবুওয়াতে মুহাম্মাদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং এরা একটি অনৈসলামী ফেরকা। আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দাবি জানিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক। ১৯০৮ সালে এই ধোঁকাবাজ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তারই সাথী এবং একই পথের পথিক ও "তাসদীকে বারাহীনে আহমাদীয়া" বই-এর লেখক হাকিম নূরুদ্দীন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এই ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকে। ১৯১৪ সালে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে দলের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদের জ্যৈষ্ঠ পুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়।

কাদিয়ানীদের অন্য একটি শাখা রয়েছে। তাকে "লাহোরী গ্রুপ" বলা হয়। "মুহাম্মাদ আলী" নামক এক ব্যক্তি তার নেতা ছিল। এ ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করে। এ ছাড়াও তার লিখিত অন্যান্য বইও রয়েছে, যার মধ্যে সে তার আকীদানুযায়ী কুরআনের হাস্যকর অপব্যাখ্যা করে। সামনে তার কুরআনের তর্জমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

আমি আমার "ফতুয়ায়ে শারঈয়্যাহ" নামক কিতাবে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাদিয়ানী ফের্কা ইসলাম বহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। তারা সর্বাত্মকভাবে মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে দূরে সরিয়ে নেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতা পথভ্রষ্ট নেতার উপর ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করছে। এগুলো হচ্ছে এই বাতিল ফের্কার আসল স্বরূপ, তাদের আকীদা-বিশ্বাসের নমুনা যা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে পেয়েছি, সংক্ষিপ্ত

আকারে পাঠক বর্গের সামনে পেশ করলাম। সে সূত্রসমূহের মাঝে নির্ভরযোগ্য এ তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের ভাই এবং বন্ধু ও ভারতে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। তাঁর ইসলামী তাবলীগ এবং আল্লাহর পথে নিষ্ঠার সহিত জেহাদ করার সুদীর্ঘ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের ভাই গবেষক ও মুহাক্কিক আলেম, উলামাকুল শিরোমনি, ইসলামী আন্দোলনের নেতা, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র)।[১]

তৃতীয় প্রবন্ধ লিখেছেন আমাদের ভাই বিখ্যাত লেখক, মুহাক্কিক আলেম আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর আল্লামা মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন (র)।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তি মনোযোগের সাথে এ তিনটি প্রবন্ধ অধ্যয়ন করবেন কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে একটি ইসলাম বহির্ভূত ফেরকা এ ব্যাপারে তিনি জলন্ত প্রমাণাদি এবং পরিষ্কার ধারণা লাভ করবেন। সাথে সাথে তার সামনে এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমানদের সাথে কিরূপ শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তাদের নিজেদের সত্য ধর্ম থেকে পথভ্রষ্ট করে তাদের ঝান্ডাতলে একত্রিত করার কেমন অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এ উদ্দেশ্যে দুনিয়াব্যাপী ভ্রান্ত আকীদা ও বিপথগামী চিন্তাধারা প্রচার করছে।

মহান আল্লাহ তাআলা এই প্রবন্ধকারদের উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং এ প্রবন্ধগুলোকে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

---

১. উক্ত লেখকের প্রবন্ধ "কাদিয়ানী সমস্যা" শিরোনামে আধুনিক প্রকাশনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে।

কুরআন পাকের কাদিয়ানীদের অনুবাদ প্রসঙ্গে

আমরা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি যে, গোমরাহ কাদিয়ানী নেতা মুহাম্মাদ আলী কুরআনে পাকের ইংরেজী অনুবাদ করে সারা বিশ্বে তা প্রচার করে। তবে কোথাও সে যে একজন কাদিয়ানী এর কোন ইংগিত করেনি, যেন পাঠকবৃন্দ এটাই বুঝেন যে, কুরআন পাক এমন একজন মুসলিম আলেম কর্তৃক অনূদিত হয়েছে যিনি কুরআনকে সম্মান করেন। ইসলামের খেদমতে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ইংরেজী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করে তা প্রচার করছেন। ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা আল্লাহর কিতাব পড়ে তার আহকাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ যেন বুঝতে সক্ষম হন।

কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এটা কুরআন মজীদের অত্যন্ত ছোট এবং ভুলে পরিপূর্ণ একটি অনুবাদ। এতে মনগড়া ও উদ্দেশ্যমূল্যকভাবে বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অনৈসলামিক বিষয়সমূহ কৌশলে পেশ করা হয়েছে। কুরআনের এ অনুবাদ দ্বারা মুহাম্মাদ আলীর উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লুকায়িত হিংসা ও শত্রুতাকে প্রশমিত করা, যারা মির্যা গোলাম আহমাদকে মুসলমান মানতে অস্বীকার করে এবং তার অনুসারীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করে।

পাকিস্তানের মীর্যা মোবারক আহমাদ কাদিয়ানী ইংরেজী অনুবাদসহ কুরআনের একটি কপি সৌদী সরকারকে পেশ করে। সৌদী সরকার মক্কা শরীফে অবস্থিত রাবেতা আলমে ইসলামীর নিকট তা হস্তান্তর করে তার শরয়ী হুকুম বর্ণনার নির্দেশ দেয়।

যখন রাবেতার সেক্রেটারী বুঝতে পারলেন যে, এ অনুবাদে অপব্যাখ্যা, ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল অর্থ করার মাধ্যমে কুরআনে পাকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় বিষাক্ত হামলা করা হয়েছে, যা তাফসীরের সুপরিচিত ওলামায়ে কেরামের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়, তখন তিনি তা রাবেতার সাংস্কৃতিক কমিটির হাতে সোপর্দ করেন এবং এটাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পরখ করে তার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন।

কমিটি গভীরভাবে তা অধ্যয়নের পর রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করে তা ১৩৯১ হিজরীর শাবান মাসে অনুষ্ঠিত ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বৈঠকে পড়ে শুনান হয়। বৈঠকে তা শুনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করা হয়।

"হিন্দুস্তানে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাদিয়ানী সম্প্রদায় গোমরাহ এবং ইসলাম বহির্ভূত একটি ফেরকা। এরা প্রকাশ্যে বাতিল আকীদা প্রচার

করছে এবং শরীআত কর্তৃক সরাসরি হারামকৃত ও নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত।

সে সর্বত্র নিজ অনুসারীদের মাঝে যে আকীদাগুলো প্রচার করছে সেগুলো হলো, গোলাম আহমাদের দাবি যে, (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর ওহীর মাধ্যমে দশ হাজারেরও বেশি আয়াত নাযিল হয়েছে। (২) যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফের। (৩) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর পরে আল্লাহ পাক তাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। (৪) তার উপর কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলের মত ওহী আসে। (৫) মাসীহ্ আলাইহিস সালাম–এর রুহ্ তার মাঝে একাত্ম হয়ে গেছে। (৬) কাদিয়ান শহরে হজ্জ করা মুসলমানদের উপর ফরজ। (৭) মক্কা ও মদীনার মত কাদিয়ানও একটি পবিত্র শহর। (৮) কুরআন পাকে উল্লেখিত মস্‌জিদে আকসা দ্বারা পরোক্ষভাবে 'কাদিয়ান'কেই বুঝানো হয়েছে।

এ ধরনের আরো অনেক বাতিল আকীদা এবং ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যা তার বই "বারাহীনে আহমাদীয়া" ও "তাবলীগে রেসালাত" ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও তার এমন আরো কতগুলো আকীদা রয়েছে যেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তৎকালীন ভারতের শাসক ইংরেজ সরকারের তোষামোদ করা, যেন তাদের সরকার আরো স্থিতিশীল হয়, অপরদিকে মুসলমানদেরকে দুর্বল বানিয়ে দেয়া, যাতে তারা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে না পারে এবং সব সময় তাদের সামনে নতজানু হয়ে থাকে।

এসব ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদা কাদিয়ানীদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তারা সর্বত্র সবসময় এগুলো প্রচার করে আসছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং মুসলমানদের গোমরাহ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যমটিই হচ্ছে কুরআনের এই অনুবাদ। এতে তারা নিজেদের বাতিল আকীদানুযায়ী কুরআনের মনগড়া অর্থ ও অপব্যাখ্যা করে তাদের সকল শাখা ছাড়াও অন্যান্য দেশেও প্রচার করছে, যেখানে তাদের কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে যেখানে তারা নিজেদের ভ্রান্ত আদর্শের ভিত্তিতে মসজিদ ও দরগাহ কায়েম করেছে সেখানেও তারা এ অনুবাদ প্রচার করছে যেন সহজেই সাধারণ মুসলমান এবং অমুসলিমদের যারা ইসলামকে জানতে পারছে না তাদেরকে বিপথগামী করতে পারে।

এছাড়াও সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একটি ষড়যন্ত্র এও ছিল যে, তারা নিজেদেরকে আহমাদী বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের সন্তানদের মুসলমানী নাম যেমন মুহাম্মাদ, আহমাদ, আলী, বাহাউদ্দীন, ইত্যাদি নাম রাখে। কুরআন পাকের এহেন ভ্রান্ত অনুবাদটি হ'ল পথভ্রষ্ট মুহাম্মাদ আলী কৃত। কাদিয়ানীরা জনসাধারণকে বিপথগামী করার কাজে এ ভ্রান্ত অনুবাদের ব্যবহার করছে এবং তা প্রচার করছে।

কমিটি এও সিদ্ধান্ত নেয় যে, মিসরের প্রাক্তন মুফতী এবং প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সদস্য শায়খ হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফকে রাবেতার পক্ষ থেকে কুরআন পাকের এ অনুবাদ সম্পর্কে কুরআনের হুকুম বর্ণনার দায়িত্ব দেয়া হোক। এ ছাড়াও কাদিয়ানীদের সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন রচিত প্রবন্ধসমূহের ভূমিকা লিখার দায়িত্বও তাঁকে দেয়া হোক। অতঃপর প্রবন্ধ তিনটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে এ ভূমিকাসহ তা প্রচার করা হোক যেন বিশ্বের মুসলমানগণ এগুলো দ্বারা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারেন। এর দ্বারা আল্লাহর মেহেরবানীতে পথভ্রষ্ট খোদাদ্রোহীদের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে। কেননা আল্লাহ পাক ধোঁকাবাজ এবং খেয়ানতকারীদের চালবাযীকে কখনো অগ্রসর হতে দেন না।

আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি মক্কা মোয়ায্যমায় বসে এ ভূমিকা লিখার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত তিনটি পুস্তিকার লেখকদের উত্তম পুরস্কার দান করুন। কেননা তাঁরা মুসলমানদের উপকারার্থে এ সমস্ত পুস্তিকা লিখে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদার রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন।

আমরা সমস্ত মুসলমানদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কুরআন পাকের অনুবাদসমূহ হতে দূরে থাকেন। কারণ এ সমস্ত অনুবাদে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনিকে লুকিয়ে পেশ করা হয়েছে।

কাদিয়ানীদের বই-পুস্তকে প্রকাশ্য যে কুফরী রয়েছে আমি মুসলমানদেরকে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি। সাথে সাথে কাদিয়ানীদের বিপক্ষে লিখিত এ তিনটি পুস্তিকার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে অধিক সংখ্যায় তা প্রচার করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার জন্য আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা কমিটি এবং তার সেক্রেটারিয়েটের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি।

আসলে রাবেতার এ উদ্যোগ সত্যের পথে জেহাদের সমতুল্য। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদাদ্রোহী দুশমনদের অপতৎপরতা থেকে আল্লাহর কালামের হেফাযত করা।

হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ (প্রাক্তন মুফতী, মিসর)
প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সদস্য
রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা।
সদস্য, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, কায়রো,
মক্কা মুকাররমা, ২২শে শাওয়াল, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭২ সন।

কাদিয়ানী মতবাদ
ইসলাম ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদঃ
হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ

(১৯৫৩ সনে যখন পাকিস্তানের পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন চলছিল এবং তৎকালীন সরকার সে আন্দোলন দমনে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তখন এ প্রবন্ধটি লিখা হয়।)

আমি এই প্রবন্ধে এমন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো যার প্রতি প্রতিটি মুসলমানেরই, তিনি যে কোন দেশেই অবস্থান করুন না কেন, গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী ভিত্তির সাথে সম্পর্কিত। যদি মুসলমানগণ এ ব্যাপারে অবহেলা করেন তাহলে এ সমস্যা এমনই এক সঙ্গীন রূপ ধারণ করবে যা পুরো ইসলামী বিশ্ব এমনকি ইসলামী বিধানের জন্য গুরুতর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং যার ক্ষতি হবে অপূরণীয়।

ইতিপূর্বে পাকিস্তানে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল, তা সকল দেশবাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। জনগণ আর সরকার সবার সামনে শুধু এ একটি সমস্যাই প্রবল আকার ধারণ করেছিল। কাদিয়ানী সংক্রান্ত যে বিষয়টি অনেক মুসলমানই ভুলতে বসেছিল, হাঙ্গামা তাদেরকে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, অনেকে ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো যে, আসলে কাদিয়ানী সমস্যা কি এতই সংগীন ও গুরুতর যা পুরো দেশের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ও আলোচনার বিষয়ে পরিণত হতে পারে? আর এজন্য সারাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উলোট-পালট হয়ে যাবে? কিন্তু এতে কিছুই করার ছিল না। মূলতঃ সমস্যাটি তার নিজস্ব ভাবধারায় এ গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার।

পাকিস্তানের ইসলামী ভাবধারার লোকদের ঐ দিকে দৃষ্টি দেয়া অবশ্যই যথার্থ। কেননা মুসলমানদের অস্তিত্ব এবং পাকিস্তান নামক নবগঠিত এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি অস্বস্তিকর বিষয়। দেশের বাইরের লোক এর আসল প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই অবগত আছেন যে, সমস্যাটির আসল গুরুত্ব কি? এ রাষ্ট্রের ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু গভীর। এ দ্বন্দ্ব কোন ফেরকা সৃষ্টি করা, সঙ্কীর্ণতা ও মাযহাবী সাম্প্রদায়িকতার বীজ নয়, যেমনটি কারো কারো ধারণা। বরঞ্চ নির্ভেজাল ইসলামী স্বার্থ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আসুন ঐতিহাসিক এবং জ্ঞানের নিরীক্ষে তা নির্ণয় করা যাক। জ্ঞান গবেষণায় এবং ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, কাদিয়ানী মতবাদ ইংরেজদের রাজনৈতিক গর্ভের জারজ সন্তান। ব্যাপারটি ছিল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ও সুপরিচিত মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (মৃ· ১২৪৬ হিজরী) জেহাদের যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে মুসলমানদের মাঝে জেহাদ ও

কোরবানীর স্পৃহা আগুনের মত জ্বলে উঠে। তাদের বুকে ইসলামী বীরত্বের জযবা ও উৎসাহ প্রবল হতে থাকে। অগণিত মুসলমান স্বীয় প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এ আন্দোলনের পতাকাতলে একত্র হন। তাঁর তৎপরতা বৃটিশ সরকারের জন্য অস্বস্তিকর ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে সুদানে শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ সুদানী জেহাদের ডাক দেন। তাতে সুদানে বৃটিশ ক্ষমতায় কম্পন শুরু হয়। তারা এটা ভাল করেই জানতো যে, এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবার যদি জ্বলে উঠে তা হলে এটা নির্বাপিত করা আর সম্ভব নয়। অন্যদিকে সাইয়েদ জামাল উদ্দিন আফগানির ইসলামী ঐক্যের আন্দোলন দিকে দিকে প্রসার ও মুসলমানদের মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হতে দেখে তারা এ সমস্ত বিপদ অনুধাবন করতে পারে। তারা মুসলমানদের মেজায ও স্বভাব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করেছিল। কেননা তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানদের মন মস্তিষ্ক ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত। ধর্মই তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং ধর্মই তাদেরকে শান্ত করে দিতে পারে। অতএব মুসলমানদের দমন ও নিস্তেজ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের আক্বীদা ও ধর্মীয় মনমানসিকতার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মীয় পথ ছাড়া মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্য অর্জনে বৃটিশ সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকেই কোন এক ব্যক্তিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদবীর ছত্রছায়ায় আত্মপ্রকাশ করানো, যার বদৌলতে সাধারণ মুসলমান ভক্তিসহকারে তার দরবারে সমবেত হবে। ঐ ব্যক্তি অনুসারীদেরকে সরকারের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার এমন শিক্ষা দিবে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না। এটা ছিল বৃটিশ সরকারের একটা চক্রান্ত। কেননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি পরিবর্তনের দ্বিতীয় এমন কোন পন্থা এর চেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল না। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছিলো একজন ভারসাম্যহীন রোগী।[১] সে মনে মনে তীব্রভাবে এমন একটি নতুন ধর্মের

---

(১) এ ব্যক্তিটির মাঝে একই সময় তিনটি এমন জিনিসের সমাবেশ ঘটে ছিল যা দেখে কোন ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারতো না যে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আসল কারণ কোনটিকে বলা যেতে পারে, যার ভিত্তিতে লোকটি এ সব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো হলো ঃ

(ক) ধর্মীয় নেতৃত্বে পৌছানো এবং নবুওয়াতের নামে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করা।

(খ) তার ও তার অনুসারীদের বইপত্রে বার বার আলোচিত আজব আজব ধ্যানধারণা।

(গ) অস্পষ্ট ও গোলমেলে রাজনৈতিক সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধি এবং ইংরেজ সরকারের সেবাদাস বৃত্তির মাধ্যমে নিমক হালালী করা।

দ্রষ্টব্য ঃ ইলিয়াস আহমাদ বরনী কর্তৃক লিখিত 'কাদিয়ানী মাযহাব'।

প্রবর্তক হওয়ার আশা পোষণ করত, যার কিছু অনুসারী হবে এবং কিছু লোক তার উপর ঈমান আনবে। তাছাড়া ইতিহাসেও যেন তার নাম ও মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ হয় যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল।

ইংরেজরা এ কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পেলো। বলা যায় তার ব্যক্তিত্বে একজন এজেন্টের চরিত্র পাওয়া যায় যে তাদের স্বার্থে মুসলমানদের মাঝে কাজ করবে। অতএব সে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ শুরু করে দিল। প্রথমে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করলো। তারপর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ঈমাম মাহদীতে পরিণত হ'ল। এবং শেষ পর্যন্ত নবুওয়াতের সিংহাসনে সমাসীন হয়। এভাবে ইংরেজরা যা চাচ্ছিল তা পূর্ণ হলো। কাদিয়ানী এ ব্যক্তিটি চমৎকারভাবে তার অভিনয় করে। আর ইংরেজরাও তার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন ক্রটি করেনি। তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং তার কাজে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও সরকারের এ সমস্ত উপকারের কথা ভুলে যায়নি। বরঞ্চ এ কথা সে সব সময় স্বীকার করতো যে, তার এ যশ ও খ্যাতি একমাত্র বৃটিশ সরকারেরই অবদান। তাই দেখা যায়, সে তার লিখিত কোন এক বক্তব্যে[২] নিজেকে বৃটিশ সরকারের "স্বউদপাদিত বৃক্ষ" বলে ঘোষণা দেয়। অন্যস্থানে নিজের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে সে লিখে ঃ–

"আমার বয়সের অধিকাংশ সময় ইংরেজ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় অতিবাহিত হয়েছে। আমি জেহাদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বেশি বইপত্র লিখি এবং ইশতেহার প্রচার করি যদি সেগুলো একত্র করা হয় তা হলে পঞ্চাশটি আলমারী তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। আমি বইগুলো সমস্ত আরব দেশ, মিসর, শাম, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌছে দেই। (দেখুন ঃ মির্যা কাদিয়ানী লিখিত তিরয়াকুল কুলূব, ১১৫ পৃষ্ঠা))। অন্য এক স্থানে সে লিখে, "আমার শৈশবকাল হতে আজ পর্যন্ত যা প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি হবে আমি এ কাজেই ব্যস্ত ছিলাম যে, লিখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে কিভাবে মুসলমানের দিল–দিমাগে বৃটিশ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মানো যায়, কিভাবে তাদেরকে ইংরেজদের হিতাকাংখী ও খয়ের খা বানানো যায় এবং কিভাবে তাদের কিছু অবুঝ ও নির্বোধ লোকের মন থেকে জেহাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায় যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম

---

(২) ১৮৯৮ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের গভর্ণরের নিকট লিখিত "আবেদন পত্র"। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মীর কাশেম আলী লিখিত ঃ "তাবলীগ ও রেসালাত", ৭ম খন্ড।

সম্পর্ক থেকে বিরত রাখছে (মির্যা রচিত "শাহাদাতুল কুরআনে"র সংযোজন অধ্যায়, ষষ্ঠ সংস্কারণ, পৃষ্ঠা ১০)। উক্ত বইতেই একটু পরে সে লিখে :- "এটা আমার বিশ্বাস, যেভাবে আমার ভক্তদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সেভাবেই জেহাদে বিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। কেননা আমাকে মাসীহ ও মাহদী স্বীকার করা মানেই জেহাদকে অস্বীকার করা" (পৃষ্ঠা ১৭)।

অন্য এক স্থানে সে বলে : আমি অনেক বই আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি যে, এ পরোপকারী সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ কখনো জায়েয নেই। বরঞ্চ নিষ্ঠার সাথে তার আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। সুতরাং বইগুলো অনেক অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করে ইসলামী দেশসমূহে পৌছে দেই। আমি জানি, এ দেশেও (ভারতে) বইগুলোর অনেক প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে যাদের মুরিদ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে তারা সর্বান্তকরণে এ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিশীল একটি দলে পরিণত হয়েছে। তাদের চারিত্রিক অবস্থা অনেক উর্দ্ধে। আমি মনে করি তারা সবাই এ দেশের জন্য বরকত স্বরূপ এবং সরকারের জন্য উৎস্বর্গীকৃত প্রাণ"।

(দ্রষ্টব্য : "বৃটিশ সরকারের প্রতি মীর্যা গোলাম আহমাদের আবেদন")

মির্যা গোলাম আহমাদের এ আন্দোলন এবং তার দল ইংরেজ সরকারের জন্য পরীক্ষিত গোয়েন্দা, বিশ্বস্ত বন্ধু, নিবেদিত প্রাণ কিছু লোক তৈরি করেছে। এ দলের বাছাই করা কিছু লোক ভারতের ভিতরে ও বাইরে ইংরেজ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত অঞ্জাম দেয় এবং এ জন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। যেমন, আবদুল লতিফ কাদিয়ানী। সে আফগানিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার ও জেহাদের বিরোধিতা করেছিল। তাকে আফগান সরকার হত্যা করে। কেননা তার প্রচারণার কারণে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, জেহাদী প্রেরণা ও যুদ্ধোৎসাহী হিসাবে বিশ্বব্যাপী আফগান জাতির যে সুপরিচিতি রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবে মোল্লা আবদুল হালিম কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানীও ইংরেজ সরকারের স্বার্থেই আফগানিস্তানে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কেননা আফগান সরকার তাদের থেকে এমন কতগুলো চিঠি ও কাগজপত্র উদ্ধার করে যাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তারা বৃটিশ সরকারের এজেন্ট ছিল এবং আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেমনটি ১৯২৫ সালে আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে জানা যায়। কাদিয়ানীদের সরকারী মুখপাত্র "আল-ফজল" ১৯২৫ সালের ৩রা মার্চ সংখ্যায় এ বিবৃতি প্রচার করে এবং প্রাণ বিসর্জনে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে। তারই ভিত্তিতে এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী তার

যাত্রালগ্ন হতে এখন পর্যন্ত সর্বদা সর্বপ্রকার দেশীয় আন্দোলন হতে বিরত থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে না মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী অংশ নেয়, না তার পরে কেউ অংশ নেয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের মোড়লীপনার ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় তল্পীবাহকদের হাতে মুসলিম বিশ্বের উপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চালানো হচ্ছিল তা তাদেরকে শোকের পরিবর্তে আনন্দ দিয়েছিল। সাধারণ ব্যবস্থা, ইসলামী বিষয়াদি অথবা রাজনৈতিক অনুভূতি ও ইসলামী প্রেরণার প্রতিফল হিসাবে সৃষ্ট ইসলামী আন্দোলন, এসব ব্যাপারে কখনো তাদের মাথাব্যথা ছিল না। সব সময় মাযহাবী তর্ক এবং মুখরোচক কথাবার্তাই তাদের কাজ ছিল।

মাসীহর মৃত্যু, মাসীহর জীবন, মাসীহর অবতীর্ণ এবং মির্যা গোলাম আহমাদের নবুওয়াতের উপর বিতর্কানুষ্ঠান পর্যন্তই তাদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই কাদিয়ানী ফিতনাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা নিজেদের বক্তৃতা, লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা এ ফিতনার মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। আর এটা স্পষ্ট যে, এমন এক রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন সরকার যে নিজেই এ ফিতনার প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক তার যুগে তেমন বেশি কিছু করাও সম্ভব ছিল না। ইসলামী মুজাহিদের মধ্যে চারজনের নাম শীর্ষে। তাঁরা হলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুনগরী, (নাদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতা) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতস্বরী, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (শাইখুল হাদীছ, দারুল উলূম দেওবন্ধ)। ইসলামী দলগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যে দলটি এ বিদ্রোহী গ্রুপের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল সে দলটির নাম হচ্ছে "মজলিসে আহরারে ইসলাম"। দলটির প্রাণ এবং নেতা ছিলেন সাইয়েদ আতা উল্লাহ শাহ বোখারী। ইসলামের গর্ব মহান চিন্তাবিদ ডক্টর মুহাম্মাদ ইকবালও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি তার বইপত্রে পরিস্কার ভাষায় লিখেন যে, 'কাদিয়ানী তৎপরতা নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র এবং তা সম্পূর্ণ আলাদা একটা ধর্ম। তার অনুসারীরা ভিন্ন একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় কখনো মহান ইসলামী উম্মাহর অংশ নয়"। এটা সর্বজনবিদিত যে, ডক্টর ইকবাল কোন দাকয়ানুসি লোক ছিলেন না। ইসলামী বিশ্বের নির্বাচিত শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনচেতা চিন্তাবিদদের মাঝে ছিল তাঁর স্থান। তিনি "ইত্তেহাদে ইসলামী"র প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের দাওয়াতের প্রাথমিক মূল নীতিই ছিল পক্ষপাতহীনতা, সততা, আর নিষ্ঠা। কিন্তু যেহেতু তিনি মির্যা গোলাম

আহমাদকে অনেক নিকট থেকেই চিনতেন[১] এবং তার মাযহাব, তার মতলব ও রহস্যাদি সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন এজন্য তিনিও এ ফেতনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান হতে আলাদা অমুসলিম সংখ্যালঘু একটি জাতি হিসাবে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাব দেন। এখানে আমরা তাঁর বিভিন্ন বইপত্র এবং বক্তৃতাসমূহ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা "স্টেটম্যান" একবার এ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লিখেন–"কাদিয়ানী মতবাদ" হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুওয়াতের ভিত্তিতে নতুন একটি জাতি সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম।[২] সে সময়ই যখন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ প্রশ্ন তোলেন যে, মুসলমানগণ কেন কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম হতে আলাদা করার জোর দাবি জানাচ্ছে অথচ কাদিয়ানীরাও মুসলমানদের অন্যান্য ফেরকাসমূহের মত একটি ফেরকা?[৩] তখন আল্লামা ইকবালই এর উত্তরে বলেন ঃ "আমরা বিষয়টির উপর এজন্য চাপ প্রয়োগ করছি যে, কাদিয়ানী তৎপরতা নবী আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত থেকে হিন্দী নবীর উম্মত তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে"। তিনি আরও বলেন, "ইহুদী জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরই একজন বিদ্রোহী দার্শনিক স্পিনোজার (SPINOZA) আকীদা-বিশ্বাস যতটুকু বিপজ্জনক হতে পারে ভারতে ইসলামী সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি এ তৎপরতা তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক"।

---

(১) উল্লেখ্য, কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং আল্লামা ইকবাল দু'জনেই ছিলেন পাঞ্জাবের বাসিন্দা।

(২) স্টেটম্যান, ১০ই জুন, ১৯৩৫ সন।

(৩) ভারতের দেশপূজক নেতা সাধারণভাবে কাদিয়ানী মতবাদকে পছন্দ করতেন। কেননা এ মতবাদ প্রসারিত হলে ভারতের পবিত্রতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানগণ তাহাদের কেবলা ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র হেজাযের পরিবর্তে ভারতকে বানিয়ে নেবে। ঐসব নেতাদের ধারণানুযায়ী–এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের হৃদয়ে দেশপূজার ভিত অনেক দৃঢ় হবে। যে সময় পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন চলছিল তখন ভারতের কিছু কিছু পত্রিকা কাদিয়ানীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। পত্রিকাগুলো কাদিয়ানীদের সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাদের পাঠকদেরকে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের সমর্থক ও সহযাত্রী বানানোর চেষ্টা চালায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা এও লিখে যে, পাকিস্তানে কাদিয়ানী ও মুসলমানদের এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ আরবী ও হিন্দী নবুওয়াতের দ্বন্দ্ব এবং এটা আসলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নবুওয়াতের অনুসারীদের দ্বন্দ্ব।

আল্লাহ্ পাক খতমে নবুওয়াতের আকীদার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য ডক্টর ইকবালের (রঃ) সীনা খুলে দেন। আর তিনি এর আসল তত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞাত ছিলেন যে, একমাত্র ইসলামী আকীদাই ইসলামের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা এবং উম্মতের পারস্পরিক বন্ধন ও শৃঙ্খলার হেফাজত করতে পারে। এ আকীদার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কোন অবস্থাতেই শিথিল দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য নয়। কেননা এ চক্রান্ত ইসলামী বালাখানার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতেরই নামান্তর। পূর্বে স্টেটম্যান পত্রিকাকে প্রেরিত যে প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তিনি লিখেন, "হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী" এ আকীদাই একমাত্র বিধান যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মসমূহের মাঝখানে পরিপূর্ণ সীমারেখা (LINE OF DEMARCA-TION) টেনে দেয়। যারা মুসলমানদের সাথে তাওহীদের ব্যাপারে একই আকীদা পোষণ করে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকেও স্বীকার করে, তবে ওহী ও নবুওয়াতের পরম্পরা বা সিসিলার সমাপ্তি স্বীকার করে না, যেমন, ভারতে ব্রাহ্মন্যবাদ, তখন এ আকীদাই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি যার আলোকে কোন দল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা বহির্ভূত তা নির্ণয় করা যেতে পারে। আমি ইতিহাসে মুসলমানদের এমন কোন দলের নাম জানি না যারা এই সীমারেখা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ইরানের একটি গোষ্ঠী "বাহাইয়াহ" অবশ্য খতমে নবুওয়াতের আকীদাকে অস্বীকার করে বটে কিন্তু তারা একথাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় যে, তারা আলাদা একটি দল, যে দল সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থে মুসলমান নয়"।

অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দীন বা ধর্ম। কিন্তু একটি সোসাইটি হিসাবে অথবা একটি জাতি হিসাবে এর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের উপরই সীমাবদ্ধ। অতএব, কাদিয়ানীদের সামনে দু'টি পথ রয়েছে। হয়তো তারা বাহাইদের অনুসরণে নিজেদেরকে মুসলমান হতে আলাদা করে নেবে, অথবা খতমে নবুওয়াতের আজব ব্যাখ্যা হতে বিরত থাকবে। অন্যথায় তাদের এ ধরনের রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা তাদের মনে লুকায়িত মতলবের প্রতিই ইংগিত করে যে, এরা কেবলমাত্র সেই সকল সুবিধাদীর লোভে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায় যে সুযোগগুলো শুধুমাত্র মুসলমান নামের সাথে সম্পর্কিত। কেননা এ ছাড়া ঐ সুবিধাদি এবং স্বার্থের কোন অংশই তারা পাবে না।

তিনি অন্য এক জায়গায় লিখেন, "কোন দল যারা সর্বজনবিদিত ও সাধারণভাবে পরিচিত ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং সে দলের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও মন-মেজায এক নতুন নবুওয়াতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা এ নতুন নবুওয়াতের অস্বীকারকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে, সে দল ইসলামের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সব সময়ই তাদের উপর মুসলমানদের কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত। ইসলামী সামাজিকতার ঐক্য একমাত্র খতমে নবুওয়াতের আকীদার উপরই সীমাবদ্ধ।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আল্লামা ইকবালের মত স্বাধীন চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তির এ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সময় গড়াতে থাকে। কাদিয়ানীরাও তাদের কাজে ব্যস্ত থেকে অরাজকতা সৃষ্টি ও বিতর্কানুষ্ঠান চালিয়ে যেতে থাকে। সন্দেহের রোগ ছড়াতে এবং ইংরেজ রাজনীতির খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামে তাদের কেন্দ্র ছিল। ইংরেজদের ছত্রছায়ায় তারা অরাজকতা সৃষ্টি করছিল। তবে কখনো তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে, কোন এক সময় কোন রাজনৈতিক বড় শক্তি তাদের করায়ত্ব হবে এবং এমন কোন তৈরি রাষ্ট্রও তাদের কর্তৃত্বে এসে যাবে যার নিরংকুশ ক্ষমতা তাদের অর্জিত হবে। কেননা প্রথমতঃ তারা রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন অংশগ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়তঃ তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং তারা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চাপা পড়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অভ্যুদয় হয় এবং কাদিয়ানীরা নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা কল্পনাও করতে পারতো না এক বিন্দু রক্তপাত ছাড়াই তারা তা পেয়ে গেল। অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা। এটা হলো কিভাবে? তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত আশ্চার্যজনক।

ভারতও বিভক্ত হয় আর পাকিস্তানও জন্ম নেয়। বৃটিশ সরকার তাদের বিছানাপত্র গুটিয়ে পাড়ি দেয়। কিন্তু যাওয়ার সময় জাফরুল্লাহ খানকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করে যায়। এ ব্যক্তি ইংরেজ বন্ধুত্বে শুধু বিখ্যাতই ছিল না, বরং ইংরেজদেরই হাতে গড়া ক্রিড়নক। ছিল। ইংরেজরাও ভাল করে জানতো যে, একমাত্র এই ব্যক্তিটিই এ ভূমিতে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে এবং দেশটিকে বৃটিশ কলোনীতে বহাল রাখতে পারবে।

সুতরাং এ উদ্দেশ্যে মরহুম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে শুধু ধোঁকাই দে'য়া হয়নি, বরঞ্চ ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্যানুযায়ী জাফরুল্লাহ খানকে পাকিস্তানের মন্ত্রী

পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। বিশেষভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। কেননা ইংরেজ ও তার মিত্র গোষ্ঠীর জন্য এ বিভাগটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তার হাতে দায়িত্ব আসার পরই এটা সম্ভব ছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যের উপর ঐ সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি চেপে থাকবে। কেননা পাকিস্তান বিশ্বে সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র। অতএব মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের উপর তার প্রভাব পড়া নিশ্চিত ছিল। যা হোক, জাফরুল্লাহ খান অবশেষে এ নব রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। যার ঈমান ছিল; এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা সবাই কাফের। কেননা তারা মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতকে স্বীকার করে না।

জাফরুল্লাহ খানের এমন মনে করাটা তার ধর্ম ও আকীদানুযায়ী পুরোপুরি ঠিক ছিল। কেননা মির্যা গোলাম আহমাদ ও তার সাথীগণ একথা পরিষ্কার ঘোষণা দেয়, মুসলমানদের যারাই এ নতুন ধর্মে বিশ্বাস করে না তারা কাফের। তাদের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। মোদ্দাকথা, তাদের সাথে কাফেরদের মত ব্যবহার করা উচিত।

কাদিয়ানীদের বর্তমান খলীফা গোলাম আহমাদের পুত্র মির্যা বশীরুদ্দীন তার কিতাব "আয়নায়ে সাদাকাতে" লিখে ঃ

"সমস্ত মুসলমান যারা মাসীহ মাওউদের হাতে বাইআতে অংশ নেয়নি যদিও তারা মাসীহ মাওউদের নামও শুনেনি তবুও তারা কাফের এবং ইসলামের গন্ডি হতে বহির্ভূত" (পৃষ্ঠা ঃ ৩৫)।

আর এই খলীফাই একবার কোর্টে বিচারকের সামনে তার বিবৃতিতে বলে ঃ

"যেহেতু আমরা মির্যা সাহেবকে নবী স্বীকার করি এবং আহমাদীগণ তাকে নবী স্বীকার করে না এজন্য কুরআনে কারীমের শিক্ষানুযায়ী 'যে কোন একজন নবীর অস্বীকার কুফরী'–এর আলোকে আহমাদীগণও কাফের"।

(দ্রষ্টব্য ঃ ১৯২২ সনের ২৬ এবং ২৯ তারিখে "আল–ফজল" পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি)।

সে একটি বক্তৃতায় তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সম্পর্কে মির্যা সাহেবের এ উক্তিটি বর্ণনা করে ঃ

"আল্লাহ তাআলার সত্তা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়েই তাদের সাথে আমাদের মত–পার্থক্য আছে"। (আল–ফজল, ৩০শে জুন, ১৯৩১)।

পক্ষপাতিত্বের সীমা এতদূর গড়ায় যে, যখন পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকাল হয় তখন নিজস্ব আকীদার কারণে জাফরুল্লাহ খান তাঁর নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেনি।

জাফরুল্লাহ খান দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে নিজের প্রভাব ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দূতাবাসের সকল কর্মচারীর পদগুলো কাদিয়ানীদের দ্বারা পূর্ণ করেন। এভাবে অন্যান্য বিভাগেও তিনি তাদেরকে ঢুকান এবং মুসলমান কর্মচারীদের উপর কাদিয়ানী অফিসারদেরকে চাপিয়ে দেন। তারা নিজেদের ইচ্ছামত তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। পদবীর অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগে মুসলমানদের মাঝে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করে। যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তারা বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার, হয়রানি ও চাকুরিচ্যুতির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আর একটি বিষয় যা এর চেয়েও বেশী বিপজ্জনক, সেটা হলো কাদিয়ানীদের বিপুল সংখ্যক লোক সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। সেনা, পুলিশ ও বিমানের বড় বড় পদে তারা ছেয়ে যায় এবং সেই সকল বিভাগে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরী করে নেয় যে, যদি নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন হয় তাহলে তারা সফল বিদ্রোহ করতে পারে। এমনকি যখনি ইচ্ছা সরকারী ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্বে নিতেপারে।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, তারা পাঞ্জাবে "রাবওয়া" নামে একটি স্বাধীন সরকার (এক সরকারের অভ্যন্তরে সমান্তরাল সরকার পদ্ধতি) গঠন করে যা নির্ভেজাল কাদিয়ানীদের নতুন আবাদী ছিল। যেখানে আইনানুগ নয় বটে, কিন্তু বাস্তবে কোন সরকারী চাকুরী কোন অকাদিয়ানীকে কখনো দেয়া হতো না। এমনকি রেলওয়ে ষ্টেশনের সাধারণ কর্মচারীও অকাদিয়ানী রাখা হতো না। পাকিস্তানের এ "রাবওয়া"কে যদি ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এটা অবাস্তব কিছু হবে না। কেননা তারা মুসলমানদের উপর ভর করে তাদেরকেই তাক করেআছে।

এ ছিল সে সমস্ত কারণ যা পাকিস্তানের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আকণ্ঠ ভাবিয়ে তুলেছিল। যখন তারা বিষয়টির প্রতি গভীর মনোযোগ দিলেন তখন তারা পাকিস্তানের মাথার উপর ঝুলন্ত নাঙ্গা তরবারি দেখতে পেলেন। তারা অনুধাবন করতে পারলেন যে, দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে বৃটিশ এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী বালাখানার অভ্যন্তরে

ঘুনে ছেয়ে যাচ্ছে এবং এটা আল্লাহ পাকের নির্দেশঃ

(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)

–এর সরাসরি বিরোধী। কেবল তখনি তারা একথা বলেন যে, কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান হতে আলাদা করে দেয়া এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তাদের সাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। এটা হুবহু ঐ প্রস্তাবই ছিল যেটা সর্বপ্রথম ডঃ মুহাম্মাদ ইকবাল পেশ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রবন্ধসমূহে অত্যন্ত কঠোরও দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাবের প্রতিই আহবান জানাতে থাকেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, শীখরা হিন্দুদের প্রতি যত না বিদ্বেষী, কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের প্রতি তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী বিদ্বেষী। কিন্তু ইংরেজ সরকার শীখদেরকে অহিন্দু সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। অথচ তাদের উভয়ের মাঝে সামাজিকতায়, সাম্প্রদায়িকতায় ও সাংস্কৃতিতে অনেক বেশি মিল রয়েছে। তারা নিজেদের মাঝে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপন করে থাকে। অথচ কাদিয়ানী মতবাদে মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়া হারাম করা হয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমানদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ককে এ বলে নাজায়েয ঘোষণা দিয়েছে যে, মুসলমানদের উদাহরণ হচ্ছে নষ্ট দুধের মত অথচ আমরা হলাম তাজা দুধের মত। নিজেদের সমস্যা ছাড়াও দেশের উন্নয়নের দৃষ্টিকোন থেকে পাকিস্তানের মুসলমানগণ কাদিয়ানীদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের দেশ তার নিজস্ব রাজনীতিতে, ক্ষমতার ব্যবহারে, সমস্যাদির সমাধানে ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ইসলামী চাহিদানুযায়ী ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে অঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ পলিসি বিদেশী শক্তি ও তাদের এজেন্টদের প্রভাব হতে পুরোপুরি মুক্ত না হবে। মরহুম

---

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের লোক ছাড়া অন্যদেরকে গোপন পরামর্শদাতা বা বন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের ক্ষতিসাধনে ত্রুটি করে না। তোমরা যত কষ্টই পাও তারা তাতে খুশীই হয়। তাদের বক্তৃতা, বিবৃতিতে বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরে যা বিদ্যমান রয়েছে তা এর চেয়েও অনেক মারাত্মক।

লিয়াকত আলী খান তাঁর শেষ দিনগুলোতে এ বিপদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিব্রত বোধ করছিলেন। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, তাঁর এই অনুভূতিটিও তাঁর আকস্মিক হত্যার কারণসমূহের একটি।

সারকথা, এই কারণগুলো পাকিস্তানের সকল ইসলামী দল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও ব্যক্তিত্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহিত করে। করাচীতে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাদের ২৩ জন প্রতিনিধির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা সরকারের নিকট দাবি জানায় যে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দে'য়া হোক। তারা সংখ্যালঘুর অধিকারপ্রাপ্ত হবে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে তাদের আসন এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের কোটা নির্ধারিত থাকবে। যেন সরকারের বিভিন্ন মাধ্যম ও আইন শৃংখলার কেন্দ্রসমূহে এ ব্যক্তিরা অবৈধভাবে তাদের প্রভাব জমাতে না পারে এবং মুসলমানদেরকে জানমাল কোরবানীর বিনিময়ে অর্জিত তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে হয়রানী করতে না পারে।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ ন্যায়সঙ্গত ও জোরদার দাবি হতে নিজের কান বন্ধ করে রাখলেন। এর প্রতি সামান্যতম ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সরকারের এহেন আচরণে নেতৃবৃন্দ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের এহেন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাধারণ অসন্তোষ প্রকাশ করা হবে যাতে সরকার এটা বুঝতে বাধ্য হন যে, এ দাবি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির প্রাণের সওদা নয়। বরং এটা ছিল সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি। বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আন্দোলন এমন বেগবান ও সাড়া জাগানো ছিল যার তুলনা এদেশের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় না।

আন্দোলন, যাকে সরকার বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তাকে নির্মূল করার জন্য প্রশাসন যাবতীয় সরকারী মাধ্যম ব্যবহার করে। অথচ তা বিদ্রোহ ছিল না। এটা এমন একটি জাতির পক্ষ থেকে বৈধ দাবি ছিল যারা অত্যন্ত ঠান্ডা মস্তিষ্কের অধিকারী এবং নিজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। তারা সরকারের সেবা ও হেফাযতের জন্য এমন কোন দুঃখ নেই যা ভোগ করেনি।

সরকার সৈন্যবাহিনী তলব করলেন। তারা "বিদ্রোহ" দমনে এলোপাথারি গুলি চালায়। অগণিত আলেম ও দীনদার ব্যক্তিগণকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। পাঞ্জাব যা এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল সৈন্যবাহিনীর দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হলো। এই

অগ্নি পরীক্ষার সিংহ ভাগ লাহোর শহরের ভাগ্যে আসে। সেখানে দু'মাসেরও বেশী সময় মার্শাল ল' বহাল ছিল এবং ব্যাপক ধরপাকড় ও গুলিতে নিরীহ জনগণের উপর হত্যার সিল্‌সিলা জারী থাকে। সরকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর সামরিক আদালতে মোকদ্দমা চালায় এবং ফাঁসির শাস্তিও শুনিয়ে দেয়। যে সকল নেতৃবৃন্দকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয় তাদের মধ্যে "পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী"-এর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ছিলেন। লাহোরের সামরিক আদালত তাঁর ফাঁসির দন্ডাদেশ ঘোষণা করে। যদিও পরের দিন তা চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। মাওলানার অপরাধ ছিল এই যে, তিনি 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ভূমিকা বর্ণনা করেন। সাথে সাথে ঐ সমস্ত কারণসমূহের ফিরিস্তিও পেশ করেন যার ভিত্তিতে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণা দে'য়া আবশ্যক ছিল। এ প্রবন্ধের বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধিক হারে তা প্রচার হয়। জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়।[১]

কিন্তু আফসোস, ইসলামী বিশ্ব তখন পর্যন্ত 'কাদিয়ানী' মতবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়নি। ইসলামী দুনিয়া আজ পর্যন্ত এ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কাদিয়ানী মতবাদ কেবলমাত্র একটি আকীদা ও মাযহাবী ফের্কা নয়। বরঞ্চ মুসলমানদের জাতীয় শৃংখলাকে তছনছ করে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমাদের মহান নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইসলামের

---

(১) পাকিস্তানের সাধারণ লোকদের ধারণা যে, সরকার এ অবস্থাকে জামায়াতে ইসলামী হতে অব্যাহতি পাওয়ার বিরাট সুযোগ বলে মনে করে। কেননা এ জামায়াত একদিকে দেশে পাকিস্তান সরকারের ওয়াদাকৃত ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিল। আর এ দাবির ভিত্তিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অন্যদিকে তারা পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল যে, তারা যেন তাদের সমস্ত পলিসি এবং দেশের সাধারণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামী করণের চেষ্টা করে। সরকারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এ দাবি মানতে তৈরী ছিল না। তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ (Secular State) রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট ছিল। এখন এ ব্যক্তিরাই দ্রুত গতিতে তুর্কী গণতন্ত্রের অনুসরণে কামালের রাজনীতির অনুকরণ করছে। আশ্চর্যের কথা তো এই যে, পাকিস্তান সরকার এমন প্রতিটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যারা তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা করে এবং তাদের কাছে ইসলামী মূলনীতি ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়। কিন্তু এ সরকারই অন্যদিকে কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। বর্তমানে জাফরুল্লাহ তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এভাবে দু'টি বিপদ পাকিস্তানকে ঘিরে রেখেছে। হয় সে ধর্মনিরপেক্ষতার শিকার, নয়তো কাদিয়ানীদের ক্রোড়ে তার স্থান।

বিরুদ্ধে এটা বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র। কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম বিদ্বেষী এবং সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী। কাদিয়ানী মতবাদ চায়, আকীদা, চিন্তা, গবেষণা ও উৎসাহ উদ্দীপনায় ইসলামের যে অবস্থান তা সে পাক। আদম সন্তানের আনুগত্য, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির যে বিপুল অংশ ইসলাম লাভ করেছে তা তার দিকে ঘুরে যাক। কাদিয়ানী মতবাদ পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করে যে, মির্যা সাহেব শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরাম, আওলিয়া, মুজাদ্দিদে দীন ও আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়জনই নন্, বরঞ্চ তিনি অনেক "উলুল আযম" আম্বিয়া ও রাসূল (আলা নাবীয়্যিনা ওয়া আলাইহিমুস সালাম) অপেক্ষা বেশী মর্যাদাশীল ও পবিত্র। কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ও গোলাম আহমাদের সাথীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মির্যা গোলাম আহমাদের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান, বরঞ্চ তার চেয়ে কিছু বেশি। তার খলীফারা খোলাফায়ে রাশেদীনের সমকক্ষ। তাদের শহর 'কাদিয়ান' মর্যাদা ও মর্তবার দিক থেকে মক্কা মোয়াযযামা ও মদীনাতুর রাসূলের সমপর্যায়ের। কাদিয়ানের হগু মক্কা মোয়াযযামার হগু হতে কোন অংশে কম নয়। তাদের দ্বিতীয় খলীফা মির্যা বশীরুদ্দীন লিখিত "হাকিকাতুন নবুওয়াত" দেখুন। মির্যা গোলাম আহমাদ সম্পর্কে সে লিখে, তিনি কিছু কিছু উলুল আযম (শক্তিশালী) নবীকেও অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন"। (পৃষ্ঠা-৩৫২)।

আল-ফজল পত্রিকার ১৪তম খন্ড ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৭ সংখ্যায় সে আরো লিখেঃ-"তিনি অনেক আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হতে পারে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন"। এ পত্রিকাটিই তার ৫ম খন্ডে ২৮শে মে, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় মির্যার সাথীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সমকক্ষ বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণান্তে লিখেঃ অতএব এ দু'দলের মাঝে পার্থক্য করা বা এক দলকে অন্য দল হতে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নয়। এ দু'টি দল আসলে একটিই। উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু সময়ের। তারা প্রথম নবীর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন আর এরা দ্বিতীয় নবীর। আল-ফজল পত্রিকা তার ৩য় খন্ডে ৫৫তম সংখ্যায় লিখেঃ-

مسیح موعود محمد است وعین محمد است

অর্থাৎ-মাসীহ মাওউদ মুহাম্মাদ এবং হুবহু মুহাম্মাদ। "আনওয়ারে খিলাফাতে" কাদিয়ানীদের খলীফা মির্যা মাহমুদ আহমাদ লিখেঃ-"এবং আমার ঈমান যে, এ আয়াত" اِسْمُهُ أَحْمَدُ দ্বারা হযরত মাসীহ মাওউদকেই বুঝানো হয়েছে"।

কাদিয়ানী মতবাদ শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত নয়, বরঞ্চ মানবজাতির সর্দার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। মির্যা গোলাম আহমাদ তার "খোৎবায়ে এলহামীয়া"তে বলেঃ-

"আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহানিয়্যাত পঞ্চম সহস্রে এজমালী গুণাবলীর সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়। সে যুগ রুহানিয়্যাতের উন্নতির শেষ যুগ ছিল না। বরঞ্চ তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্রমবিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। অতঃপর এ রুহানিয়্যাত ষষ্ঠ সহস্রে অর্থাৎ এ যুগে (মাসীহ মাওউদ গোলাম আহমাদের যুগ) পুরোপুরি বিকশিত হয়" (পৃষ্ঠা-১৭৭)।

সে আরো বলে ঃ-

لَه خَسَفُ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ وَإِنَّ لِى + غَسَا الْقَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ أَتُنْكِرُ

অর্থাৎ-তার (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্য শুধু চন্দ্রগ্রহণের প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে। আর আমার জন্য প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের (গ্রহণের) প্রমাণ। এখনও কি তুমি অস্বীকার করবে? (এজাজে আহমদী পৃষ্ঠা-৭১)।

কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে মির্যা সাহেবের কবরও জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযার শরীফের মতই মর্যাদাসম্পন্ন। কাদিয়ানের পক্ষ থেকে সেখানে আগতদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতমালার উদ্ধৃতি দেখুন যা আল ফজল পত্রিকার দশম খন্ডে ১৯২২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ৪৮তম সংখ্যায় কাদিয়ানের প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়-"এ পরিপ্রেক্ষিতে মদীনা মুনাওয়ারার সবুজ গম্বুজের নূরানী কিরণের পূর্ণছটা এই সাদা গম্বুজে বিকিরিত হচ্ছে। মনে করুন, আপনি সেই বরকতসমূহের অংশীদার হচ্ছেন যা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায়ে আতহারের জন্যই সীমাবদ্ধ। কতইনা দুর্ভাগা সে ব্যক্তি যে আহমাদী হজ্জে আকবরের এ পূণ্য হতে বঞ্চিত হল"।

এভাবে কাদিয়ানীরা এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, তাদের কাদিয়ান শহরটি তিনটি পবিত্রতম স্থানের একটি। কাদিয়ানীদের খলীফা মির্যা মাহমুদ আহমাদ লিখে-

"আল্লাহ পাক এ তিনটি স্থানকে (মক্কা, মদীনা ও কাদিয়ান) সম্মানিত করেছেন এবং স্বীয় তাজাল্লী প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করেছেন" (আল-ফজল ৩রা ডিসেম্বর,

১৯৩৫)। অতঃপর কাদিয়ানী মতবাদ আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বালাদে হারাম (মক্কা) এবং মসজিদে আক্সা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতকে কাদিয়ান শহরের সাথে সম্পর্কিত করে। মির্যা গোলাম আহমাদের বক্তব্য ঃ (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا)

কুরআনের এ আয়াত তার মসজিদের বৈশিষ্ট বর্ণনায় বলা হয়েছে।

"বারাহীনে আহমদীয়া"র টীকার সংক্ষিপ্তঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৫৮

দুররে ছামীন ৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়ঃ

زمین قادیان اب محترم ہے + ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(অর্থাৎ–কাদিয়ানের মাটি এখন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। মানুষের ভীড়ে আজ তা পবিত্র হারামে পরিণত হয়েছে।)

আল–ফজল পত্রিকার ২০তম খন্ডে ১৯৩২ সালের ২১শে আগস্ট সংখ্যায় সে লিখে–

(سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ)

এই আয়াতে উল্লেখিত মস্‌জিদে আক্সা দ্বারা কাদিয়ানের[১] মস্‌জিদকেই বুঝানোহয়েছে।

যখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ালো যে, কাদিয়ান শহর আল্লাহর পবিত্র শহরের সমকক্ষ, বরং তার চেয়ে কিছু বেশী, তখন অবশ্যই তার উদ্দেশ্যে সফর করা হজ্জ সমতুল্য হবে। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী মর্যাদাশীল হবে। সুতরাং মির্যা মাহমূদ আহমাদ জুমআর খুতবাতে বলেঃ–

"এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আরেকটি ছায়া হজ্জ নির্ধারণ করেছেন যেন তিনি যে জাতিকে দিয়ে ইসলামের উন্নতির কাজ নিতে চান তারা এবং ভারতের গরীব মুসলমানরা এতে অংশ নিতে পারে।" (আল্ ফজল ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২)। কাদিয়ানী ফের্কার অন্য এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আর এক কদম আগে বেড়ে বলেঃ–

"যেভাবে আহমাদী মতবাদ অর্থাৎ হযরত মির্যা সাহেবকে বাদ দিয়ে ইসলামের যেটুকু বাকি থাকে তা হয় শুষ্ক ইসলাম। অনুরূপভাবে এ ছায়া হজ্জ বাদে মক্কার

---

(১) কিন্তু গোলাম আহমাদ যে কাদিয়ান শহর সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দাবি করেছিল তা দেশ বিভাগের পূর্বে এবং এখনো ভারতের অংশে রয়েছে। সেখান থেকে কাদিয়ানীদেরকে বিতাড়িত করা হয় এবং তাদের কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সাথে সেখানে তাদের বাৎসরিক হজ্জও বাতিল হয়ে যায়। ছুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কুদরতের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হজ্জও শুষ্ক থেকে যায়। কেননা সেখানে আজকাল হজ্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হয় না"। ('পয়গামে সুলাহে' ২১তম খন্ড ২২তম সংখ্যা লাহোর)। তাদের এ ধরনের বক্তব্যে আন্দাজ করুন যে, কাদিয়ানী মতবাদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্মে পরিণত হওয়ার জন্য কেমন লালায়িত হয়ে আছে এবং তার জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের নিজস্বঃ একজন নবী হবে। সাহাবা এবং খলীফা হবে। পবিত্র স্থান থাকবে। তার নিজস্ব ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য থাকবে। নিজস্ব সাহিত্য ও প্রচারপত্র থাকবে। এবং ইসলামের অমর ও চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারিত্ব, ইসলামের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রথম ঝর্ণাধারা ও উৎস, ইসলামের পবিত্র স্থান ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ অর্থাৎ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু হতে তারা স্বীয় অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন করে যে কোন উপায়েই হোক উল্লেখিত প্রতিটি জিনিসের বিকল্প হিসাবে নতুন আরেকটি জিনিস তার অনুসারীদের জন্য সরবরাহ করছে। কিন্তু এ মহান বিষয়গুলোর বিকল্প কিভাবে হতে পারে? এসব হতে আল্লাহর পানাহ। আর এভাবেই কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ নবী আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যের স্পৃহা, তাঁর স্মরণে আস্বাদন ও তাঁর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ হতে বিপথগামী হয়ে কাদিয়ানী নবীর ভালবাসা, তার আযমত ও মহত্বের গুণকীর্তন, তার জীবনী অধ্যয়ন এবং তার অনুসরণ শুরু করে। এ লোকগুলো ইসলামের উজ্জ্বল ও জীবন্ত ইতিহাস, ঈমান ও বীরত্বের ইতিহাস এবং মানবিক শারাফাতের ইতিহাস বাদ দিয়ে এমন এক ইতিহাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ে যা সুস্পষ্ট ও সরাসরি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস, অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী ও নির্দয় সরকারের চামচাগিরির ইতিহাস, জী হুজুরী ও চাপলুসির ইতিহাস এবং গোয়েন্দাগিরি ও মুনাফেকীর ইতিহাস। এ লোকগুলো সে সব মহান ব্যক্তিত্ব যারা সত্যিকার অর্থে মানবতার গর্ব এবং যারা মানব জাতির নয়নকে শীতল করে, যারা পাহাড়সম মর্যাদার অধিকারী ও মানবতার মূর্ত প্রতীক এবং ইতিহাসের অনন্ত ও ক্ষয়হীন আদর্শের বাহক, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই সমস্ত নিকৃষ্ট ও মন যোগানো প্রকৃতির মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় যারা গোলামীর ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না। যারা ভাওতাবাজী ও ধোঁকাবাজী এবং অন্তর বিক্রির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ জানে না। ঐ সমস্ত লোক জীবন্ত ও অনন্ত ইসলামী শিক্ষার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এমন এক হীন, নিকৃষ্ট ও নিস্তেজ লিটারেচারের প্রতি ঝুঁকে পড়ে যার মধ্যে অনুন্নত বর্ণনা ভঙ্গি, অশ্লীল কথাবার্তা, বিশ্রী গালাগালি, স্ববিরোধী উক্তি, ডাহা মিথ্যা, লম্বা চওড়া দাবি, হাস্যকর ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ বাণীর

শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না যার কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি (এবং ইন্‌শাআল্লাহ কখনো হবেও না)। এ লোকেরা সেই পবিত্র শহর যেথায় ওহী নাযিল হয়েছে এবং যেখানে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছেন, যেখানে মানবতার বিদ্যাপীঠ রয়েছে, যা মানবতার আশ্রয়স্থল, যার আকাশ হতে এ ধরার সুবেহ সাদেক উদিত হয় সেই শহর হতে ভক্তির আত্মীয়তা ছিন্ন করে এমন এক শহরকে শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করতে চায় যা আসলে গোয়েন্দাগিরির আস্তানা এবং মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুনাফেকীর ফাঁদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যেখানে জাতীয় ও ধর্মীয় বিষয়াদির শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান করা হয়। এইত হচ্ছে কাদিয়ানী মাযহাবের স্বরূপ যা প্রতিটি ভালকে মন্দে পরিণত করে। (بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً) কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামী বিশ্ববদনের সেই পঁচা অংশ যে অংশটি তার অভ্যন্তরে নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতা, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের জী হুজুরী ও চামচাগিরি লুকিয়ে সে সমস্ত অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠির আনুগত্য ও দাসবৃত্তির বিষ ছড়াচ্ছে যারা আল্লাহর যমিনকে অত্যাচার ও অরাজকতায় পূর্ণ করে রেখেছে এবং দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তাদের গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

এই কাদিয়ানী মতবাদের অপরাধসূচী কতই বা বর্ণনা করা যায়? এ মতবাদ ইসলামী বিশ্বের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে তাদেরকে চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় নিক্ষিপ্ত করে। ইসলামের আসল ঝর্ণাধারা ও তার উৎস এবং তার পরীক্ষিত মহান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততাকে টলটলায়মান করে দেয়। জাতির জাকজমকপূর্ণ অতীত ইতিহাস, তার উজ্জ্বল দিনগুলো এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় ব্যক্তিবর্গ হতে জাতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তাছাড়া নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের ও তাদের অনুসারীদের জন্য পথ পরিস্কার করে দেয়। ইসলামের ক্ষয়হীন শক্তি ও তার বাসন্তি জীবনধারা সম্পর্কে খারাপ ধারণার জন্ম দেয়। মুসলমানদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ হতে নিরাশ করে দেয়। কাদিয়ানী মতবাদ মুসলমানদের ধ্যানধারণা, আন্তর্জাতিক সমস্যাদি এবং ন্যায়ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যার জন্য আল্লাহ তাআলা এ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে দূরে সরিয়ে কিছু গুরুত্বহীন বিষয়ের মাঝে জড়িয়ে ফেলে। এ মহান জাতিকে সেই ইউরোপিয় জাতির গাড়ীর কুলিতে পরিণত করার হীন প্রচেষ্টা চালায় যার ইঙ্গিতে এদের আবির্ভাব ঘটে এবং যাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এরা লালিত হয়।

আফসোস, কাদিয়ানী মতবাদ মির্যা গোলাম আহমাদের মত নিকৃষ্ট ও দুর্বল চিত্তের মানুষকে নবুওয়াতের মুকুট পরিয়ে মানবতাকে ততটুকু অধঃপতনের দিকে

নিক্ষেপ করেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি যতখানি সমুন্নত করেছিল। এ মতবাদ তাঁর নিষ্কলংক সত্যতাকে কলংকিত করেছে। এজন্য এর অস্তিত্ব এত কঠিন অপরাধ যা কখনো ক্ষমা করা যায় না এবং এটা এক ক্ষমাহীন অপরাধ যা ইতিহাস বিস্তৃত হতে পারে না।

কাদিয়ানী সমস্যা কোন একটি রাষ্ট্র বা সরকারের সমস্যা নয়। এটা কারো ঘরোয়া বা আভ্যন্তরীণ বিষয়ও নয়। এটা পুরো মুসলিম বিশ্বের সমস্যা। এটা ইসলামী আকীদার প্রশ্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের প্রশ্ন। মহান মানবতার প্রশ্ন।

যদি এ মহান আকীদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তার সম্মানে হস্তক্ষেপ বা আঘাত হানা হয়, যদি তার পবিত্রতাকে কলংকিত করা হয় তাহলে তা হবে মাটির এ গোলাকার পৃথিবীর জন্য চরম অকল্যাণ।

এতো হ'ল কয়েকটি বাস্তব ও নিরেট বিষয়। আল্লাহ ভাল জানেন, একমাত্র ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ, মানসিক যন্ত্রণা ও ভবিষ্যতের চিন্তাই এ বিষয়গুলো লিখতে আমাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু যারা সত্য হতে দূরে ও কল্পনার রাজ্যেই বাস করতে আগ্রহী এবং সত্য সম্পর্কে নিজেদের ধোঁকায় বন্দী রাখতে চান তাদের জন্য এবং যাদের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আকীদার কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেন এদের জন্যও আমার কাছে কোন বিকল্প ওজর নাই।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়

শায়খ মুহাম্মাদ খিদির হুসাইন
রেক্টরঃ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর।

অনুবাদঃ হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ

ভূমিকা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ও দীপ্ত একটি জীবনবিধান নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। এ বিধানে কোন রকম জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই এবং তা এত বেশী মজবুত যে, সন্দেহ ও সংশয় তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। যে সকল মহান ব্যক্তি এ বিধান মহানবী সাল্লালাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেন তাদের অন্তরদৃষ্টি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল এবং ভাল ও পূণ্যের পথকে তারা ভালভাবে অনুধাবন করতেন ও বুঝতেন। তাদের বিবেক ও দূরদর্শিতা চূড়ান্তভাবে পরিপক্ক ছিল। তারা তাদের উত্তরসূরীদের কাছে তা হুবহু পৌছে দেন এবং সে পথে জান ও মাল কুরবানী দিতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি। এভাবে শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বে বিজয়ী ও বরেণ্য হন। এটা তাদের প্রচেষ্টা ও কুরবানীর ফল ছিল যে, বিশ্বে এ মহাসত্য ধর্ম অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা অনন্তকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এটা পৃথিবীর বুকে এমন একটি সংরক্ষিত ধর্ম যে, মানুষের ধোঁকাবাযি এবং ষড়যন্ত্র তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। দ্বীনের এরকম সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরাসরি আল্লাহ পাকের পবিত্র কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীছেরই অগ্রণী ভূমিকার ফল। কেননা এ দু'টো উৎসই সর্ব যুগে এমন কিছু সুদক্ষ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয় এবং অনন্তকাল ধরে জন্ম দিতে থাকবে যারা সর্ব প্রকার বক্রতা হতে পবিত্র এবং সর্ব প্রকার মানসিক দুর্বলতা হতে মুক্ত দৃষ্টি দ্বারা সে সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করেন। আর এ কারণেই তারা অতি অল্প সময়ে বাস্তব সত্যের গভীর পর্যন্ত পৌছে যান। সত্য প্রাপ্তির সাথে সাথে এর প্রমাণাদিও তাদের আয়ত্তে এসে যায় যা সেই সত্যে অপবাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী প্রতিটি জিহ্বাকে (মাধ্যম) কেটে ফেলে দেয় এবং ধোঁকাবাজ ও চালবাজদের প্রতিটি পদক্ষেপের ঝালাইকৃত আস্তর খুলে দেয়।

আল্লাহ তাআলার পবিত্র ইরশাদ ঃ–

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ)

অর্থাৎ "আমি এ যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

বিশুদ্ধ ইতিহাস হতে জানা যায়, সর্বকালে মহাসত্য দীনের সাথে কিছু কু-প্রকৃতির লোকের পাল্লা পড়ে আসছে যাদের মস্তিস্ক বক্রতা ও গোমরাহীকে পছন্দ করে এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এজন্য তারা সঠিক তথ্য হতে বিমুখ হয়ে দীনের মধ্যে অপব্যাখ্যার প্রচেষ্টা চালায় এবং সোজাপথে চলার পরিবর্তে বক্রপথে পতিত হয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে।

এ বক্রতা ও গোমরাহী শুধুমাত্র সে সব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না যারা মূর্খ হওয়া সত্বেও দীনকে বুঝার এবং তার শিক্ষার উপর গবেষণা করার দাবি করে। যেমনটি সত্য পথ বিবর্জিত কিছু বাতিল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের অবস্থা ছিল। বরঞ্চ এ বক্রতা ও গোমরাহী আরো একটু অগ্রসর হয়ে এমন কিছু ব্যক্তিকেও দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করে যারা এও দাবি করতে শুরু করে যে, তাদের উপর আসমান হতে ওহী আসে। তারা আরো দাবি করে যে, তারা নিজেদের মুখ দিয়ে যে সব আবোল তাবোল প্রলাপ বকে সেগুলো আল্লাহ তাআলার পবিত্র কিতাব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তাদের অন্তরে তা প্রেরিত হয়েছে। নবী হওয়ার দাবিদার কিছু লোক তো এমনও আছে যাদের সিলসিলা তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। যেমন হারেছ ইবনে সাঈদ। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় তার অভ্যুদয় হয়েছিল এবং অনেক লোক তার হাতে বিপথগামী হয়। শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আবদুল মালেক ইব্‌ন মারওয়ান তাকে হত্যা করেন। বিশ্বে তার কোন নিশানাও আর বাকি রইলো না। এভাবে ইসহাক আখরাস নামের অন্য এক ব্যক্তি ছিল। সাফ্‌ফাহর খেলাফাতের সময় সাধারণ্যে তার আবির্ভাব ঘটে। অনেক লোক তার অনুসারী হয়। যখনি তাকে হত্যা করা হয় সাথে সাথে তার ফেৎনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও নবুওয়াতের দাবিদার কিছু এমন ব্যক্তিও ছিল যাদের দাওয়াতের প্রভাব তাদের মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে। যেমন হুসাইন ইবন হামাদান খুসাইবী। সে হামাত এবং লাজিকীয়ার পাহাড়ী এলাকায় তার বাতিল ফের্কার মতবাদ প্রচার করে। তার

সাথে এখনো নূসাইরীদের সম্পর্ক বিদ্যমান। কাদিয়ানী ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমাদের সামঞ্জস্য রয়েছে দ্বিতীয় প্রকার এই লোকদের সাথে। আমাদের কাছে আরব ও অনারব দেশ যেমন আমেরিকা হতে এ সম্পর্কিত বেশ কিছু চিঠি আসে। তাতে এ ফের্কার মূল রহস্য এবং ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। চিঠিপত্র আগমনের এ সিলসিলা বিশেষভাবে ঐ সময় শুরু হয় যখন "কায়রোর" মাসিক পত্রিকা "নূরুল ইসলামে" (১ম খন্ডের ৫ম সংখ্যায়) আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাতে আমি বাহাই সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করি। কিছু কিছু পত্রে এ সম্প্রদায়ের প্রচারকদের কিছু রহস্যাবৃত ও অদ্ভুত মতামত ও মন্তব্যের উল্লেখ করে এ প্রস্তাব দে'য়া হয় যে, এ সমস্ত মন্তব্যের সমালোচনা করা হোক। মুসলমানদেরকে তাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত হতে মুক্ত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এতদিন পর্যন্ত আমরা এ ফের্কা (কাদিয়ানী) সম্পর্কে কিছু লিখা হতে বিরত ছিলাম। তার কারণ, আমাদের কাছে এ সম্প্রদায়ের মূল বইগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না যেগুলোর আলোকে তার ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং তুলে ধরা যায় জনসাধারণের সামনে এ ফের্কার জন্মদাতাদের আসল পরিচয়। বর্তমানে আমাদের নিকট এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমাদ ও তার প্রচারকদের রচিত এত বেশী বইপত্র সংগ্রহীত হয়েছে যেগুলো অধ্যয়ন করে তাদের মূল রহস্য অত্যন্ত সহজভাবে স্বয়ং নিজে বুঝা এবং অন্যকেও বুঝানো যেতে পারে। সুতরাং আমরা পাঠকবৃন্দের সামনে এ বাতিল ফের্কার বাতিল মতবাদ এবং এর বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে কয়েকটি অধ্যায় পেশ করছি যেন তারা অবগত হতে পারেন যে, ফের্কাটির প্রতিষ্ঠাতার লালন-পালন ও ক্রমবিকাশ কোন প্রেক্ষাপটে হয়েছিল। বিভ্রান্তিকর যে সমস্ত দাবি নিয়ে সে মাঠে নামে পাঠক তাও অবগত হবেন। আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে, আজ এ ফের্কার যেসব প্রচারক মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমান যুবকদের মাঝে ফেৎনা সৃষ্টি করা। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, ফেৎনা 'সৃষ্টি হত্যার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য ব্যাপার।

মির্যা গোলাম আহমাদ

বংশ পরিচয়, জন্ম, লালন পালন ও শিক্ষা দিক্ষা

মির্যা গোলাম আহমাদ নিজের বংশ পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করে যে, তার পূর্বপুরুষদের আসল নিবাস ছিল সমরকন্দে। অতঃপর তারা সেখান থেকে হিন্দুস্তানে পাড়ি দেয় এবং কাদিয়ানকে তাদের বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করে। এলাকাতে তারা ক্ষমতা অর্জন করে। পরে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তারা বিপদাপন্ন হয়ে দুঃখে কষ্টে পতিত হয়। তাদের শক্তি ধীরে ধীরে শেষ হতে থাকে এবং সমস্ত ধনসম্পদ অন্যেরা লুটে নেয়।

এরপর মির্যা সাহেব লিখেঃ–

"অতঃপর বৃটিশ শাসনামলে আল্লাহ আমার পিতাকে তার হৃত কিছু গ্রাম ফিরিয়ে দেন"।

মির্যা গোলাম আহমাদ ১২৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। যখন তার শিক্ষার বয়স হয় তখন সে কুরআন এবং কিছু ফার্সী কিতাব পড়া শুরু করে। যখন তার বয়স ১০ বছর তখন সে আরবী ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। ১৭ বছর বয়সে একজন ওস্তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার কাছে আরবী ব্যাকরণ, নাহ, ছরফ, মানতিক ও দর্শনের উপর পড়াশোনা করে। সাথে সাথে পিতার কাছে ডাক্তারী শিখতে থাকে। কোন ওস্তাদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেনি। নিছক শখের বশবর্তী হয়ে নিজ থেকে তা অধ্যয়ন করতে থাকে।[১] এখনো তার শিক্ষা কোন বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌছেনি, এমতাবস্থায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অন্যান্য যুবকদের মত গোলাম আহমাদের মনেও একটু চেষ্টা করে সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির উৎসাহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং সে শিয়ালকোট গমন করে এবং সেখানে ডেপুটি কমিনারের অফিসে চাকুরী লাভে সমর্থ হয়। চাকুরী লাভের মাত্র চার বৎসর সময়ে পিতার নিজস্ব ব্যবসাতে তার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং পিতার ইচ্ছা পূরনার্থে চাকুরী ছেড়ে কাদিয়ান ফিরে আসে।

---

(১) ইংরেজী ভাষায় মির্যা সাহেবের পুত্র মির্যা মাহমুদ লিখিত "আহমাদ পয়গম্বর আখেরুযযামান" দ্রষ্টব্য।

১৮২৬[২] সালে তার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সে দাবি করে যে, তাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, আমার পিতা বাদ মাগরিব মৃত্যুবরণ করবেন। কাদিয়ানীদের দাবি অনুযায়ী এটাই ছিল সর্বপ্রথম ওহী যা মির্যা সাহেবের উপর অবতীর্ণ হয়। এরপর সে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করতে থাকে। তার এ দাবি সত্বেও যে, সমস্ত কথা তাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে, মুসলমানদের কেউ তা থেকে একটুও গ্রহণ না করে তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিত। মির্যা সাহেব পাঞ্জাবের অন্য একটি শহর লুধিয়ানা গমন করে এবং সেখানে পৌছার সাথে সাথে একটি ইশতেহার প্রচার করে। ইশতাহারের বক্তব্য ছিলঃ "আমি সেই মাসীহ মাওউদ, মুসলমানরা এতদিন যার অপেক্ষা করছিল"। ওলামায়ে কেরাম তার এ দাবিটিও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং একে মিথ্যা আখ্যা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তার মোকাবেলা করে। তাদের একজন ছিলেন মাসিক "এশায়াতুস্ সুন্নার" সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালুবী। তিনি মির্যা সাহেবের সাথে বিতর্কানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অনেক আলেমকে লুধিয়ানাতে সমবেত করেন। কিন্তু সেখানকার ইংরেজ ডিপুটি কমিশনার যিনি মির্যা সাহেবকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করছিলেন এ বিতর্কানুষ্ঠান করার অনুমতি দেননি এবং ঐ দিনই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইনসহ আলেমদের নামে নোটিশ জারী করেন।

এরপর মির্যা সাহেব দিল্লী আসে এবং তার মন্তব্যাদি প্রচার শুরু করে। ওলামায়ে কেরাম এর কঠোর বিরোধিতা করেন এবং মির্যা সাহেবকে বিকর্তানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন যে, বিতর্কানুষ্ঠানে মুসলমানদের পক্ষে মুহাদ্দিছ মাওলানা নাযীর হুসাইন সাহেবই বক্তব্য পেশ করবেন। কিন্তু মির্যা সাহেব এ বিতর্কানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য কাদিয়ানীরা যেমনটি বলে, তারা নাকি মাওলানা নাযীর হুসাইন সাহেবকে মুবাহালার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি কসম খেয়ে বলবেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এখনো জীবিত এরপর তিনি যদি পরবর্তী এক বৎসর জীবিত থাকেন এবং ইতিমধ্যে তার উপর যদি কোন বিপদ নেমে না আসে তাহলে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, মির্যা সাহেব তার নবুওয়াতের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কিন্তু মাওলানা নাযীর হুসাইন সাহেব ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম হক ও বাতিল নির্ণয়ের জন্য

(২) যেহেতু মির্যা গোলাম আহমাদ তার সব কটি বইতে ইংরেজী তারিখ ব্যবহার করে এজন্য আমরাও ইংরেজী তারিখ ব্যবহারে বাধ্য হই।

বিতর্কানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। মির্যা সাহেবের পেশকৃত মুবাহালার আমন্ত্রণ আসলে রনেভংগ দেয়ার অগ্রহণযোগ্য একটা চাল ছিল মাত্র। এরপর দিল্লীর মুসলমানরা মির্যা সাহেবের সাথে মুনাযারা (বিতর্কানুষ্ঠান) করার জন্য ভুপাল থেকে মাওলানা মাহমুদ বাশীর সাহেবকে আমন্ত্রণ জানান। মির্যা সাহেবের পুত্র মাহমুদ এ ঘটনার উল্লেখ করে শুধু এটুকু লিখে যে, এ মুনাযারা (বিতর্কানুষ্ঠান) প্রচার করা হয়েছিল। ১৮৯২ সালে মির্যা সাহেব পুনরায় লাহোর ফিরে আসে। এখানে তার ও একজন আলেমে দীন মাওলানা আবদুল হালীম সাহেবের মধ্যে মুনাযারা হয়।

এ মুনাযারার কথা উল্লেখ করার পর মির্যা তনয় মির্যা মাহমুদ আর কিছুই বর্ণনা দেয়নি যে, মুনাযারা কেমন হয়েছিল এবং তাতে কারা জয়ী হয়। ১৮৯৬ সালে লাহোরে একটি ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মাযহাবের প্রতিনিধি যোগদান করেন। মির্যা মাহমুদ লিখেঃ স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমাদই এ সম্মেলনের প্রস্তাবক ছিল। প্রস্তাব পেশ করার পেছনে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণের সামনে তার পয়গামের মূল তত্ত্ব স্পষ্ট করে দে'য়া। কাদিয়ানী মহদয়ের ভাষ্য, সম্মেলনে পাঠের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ প্রস্তুত করার সময় মির্যা সাহেব কঠিন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তবে তিনি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেই ক্ষান্ত হন। কাদিয়ানী মহাশয়দের দাবী অনুযায়ী মির্যা সাহেবকে ওহীর মাধ্যমে জানান হয় যে, সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে তার প্রবন্ধটিই সর্বাধিক শক্তিশালী প্রবন্ধ হবে। কাদিয়ানীরা এও বলে যে, তখন মির্যা সাহেবের অনুসারীর সংখ্যা তিন শতের বেশী ছিল না।

১৮৯৭ সালে তুর্কী রাষ্ট্রদূত হুসাইন কামী মির্যা গোলাম আহমাদকে তার সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মির্যা সাহেব তার আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হুসাইন কামী নিজেই তার সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। মির্যা সাহেব তার সম্মুখেও দাবি করে যে, "আমার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়"। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুসাইন কামী লাহোরের কিছু পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যাতে মির্যা সাহেবের নবুওয়াত প্রাপ্তির দাবির তীব্র সমালোচনা করা হয়। এ প্রবন্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এভাবে যে, পাঞ্জাবের মুসলমানদের মাঝে মির্যা সাহেবের বিরোধিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সে বৎসরই "আস-সুলহু খায়র" (সমঝোতাই উত্তম) নামে মির্যা সাহেব একটি ইশতিহার বিলি করে। ইশতিহারে সে ওলামাদের কাছে আবেদন জানায় যে, তারা যেন দশ বৎসর তার বিরোধিতা ও তাকে ভাল মন্দ বলা হতে বিরত থাকেন। কেননা যদি

সে আসলেই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে এ সময়ের মধ্যেই তার মুখোশ আপনা হতেই উন্মোচিত হয়ে যাবে। আর যদি সে তার দাবিতে সত্য হয় তাহলে হক সম্পর্কে অবগত হয়ে আল্লাহ তার দীনের শত্রুদের ও তার প্রেরিত রাসূলগণের অস্বীকার কারীদের জন্য যে আযাব নাযিল করে থাকেন সে আযাব থেকে বাঁচার জন্য ওলামাদের এ সময়টুকু যথেষ্ট হবে।

কিন্তু ওলামা সমাজ এত সরল ছিলেন না যে, মির্যা সাহেবের এ চালবাজী তাদেরকে প্রভাবিত করবে। তাঁরা মির্যা সাহেবের এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মির্যা সাহেবের বিরোধিতা ও তার শঠতা এবং ধোঁকা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

একই বৎসর মির্যা সাহেবের দিলে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে তাবলীগের কাজ নিশ্চিন্তভাবে অব্যাহত রাখা যেতে পারে এমন একটি চক্রান্তের উদয় হয়। সে উপ-প্রশাসক সমীপে এ বলে আবেদন পেশ করে যে, ভারতে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের যে পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে, ধর্মীয় ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা ও আগত দিনের মতানৈক্যই হচ্ছে তার আসল কারণ। অতএব এমন একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যা প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীদের এ অধিকার নিশ্চিত করবে যে, তারা নিজ নিজ মাযহাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে পারবে এবং অন্যদের অনধিকার চর্চা ও হৈ চৈ হতেও নিরাপদ থাকবে!

১৮৯৮ সালে সে তার অনুগামীদের জন্য একটি আইন জারী করে। আইনে বলা হয়, কোন অনুসারী স্বীয় কন্যাকে তার নবুওয়াতের অস্বীকারকারীদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করতে পারবে না। ঐ বৎসরই সে আহমাদী মতবাদের ভিত্তিতে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে কাদিয়ানে একটি স্কুলও স্থাপন করে।

১৯০০ সালে কাদিয়ানে সে একটি মসজিদ নির্মান করে। কিন্তু তার ফাঁদ হতে হেফাযত প্রাপ্ত কিছু আত্মীয় সে মসজিদের সামনেই একটি দে'য়াল তুলে দেয়। এ দেয়ালের কারণে মির্যা সাহেবের অনুসারীদের জন্য মসজিদে পৌছুতে অনেক দূর ঘুরে আসতে হতো। সুতরাং মির্যা সাহেব এ সমস্ত আত্মীয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। ইংরেজ বিচারক মসজিদের সম্মুখ থেকে দে'য়াল সরিয়ে দে'য়ার নির্দেশ দেন।

একই বৎসর সে তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে একটি খোৎবা প্রদান করে এবং তার নাম "খোৎবায়ে এলহামিয়া" রাখা হয়। কাদিয়ানীরা এটাকে মির্যা সাহেবের মুজেযা

সমূহের একটি বলে গণ্য করে।

সামনে আমরা তার খোৎবায়ে এলহামিয়াতে প্রাপ্ত প্রলাপ ও আগামাথাহীন অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তার যৎকিঞ্চিত আলোচনা করবো।

১৯০১ সালে সে তার অনুসারীদেরকে আদমশুমারী করা এবং রেজিষ্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। তার পুত্র মাহমুদ বশীর বলে, "বৎসরটি তাদের এবং মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বছর ছিল"।

১৯০৩ সালে সে তার মাযহাব প্রচারকল্পে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। তারা "আদইয়ান" নামে পত্রিকাটির নামকরণ করে। পত্রিকাটি ইংরেজী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হত। তার কিছু প্রবন্ধ সে নিজে লিখতো।

একই বছর সাইয়েদ করিমুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মানহানী'র মামলা দায়ের করলে মির্যা সাহেবকে ঝিলাম এজলাসে তলব করা হয়। কিন্তু আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। ১৯০৩ সালে কাবুলে "আবদুল লতিফ" নামক তাদের একজন প্রচারককে ধর্মান্তরীত হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়। সে বছরই মির্যা সাহেব একটি প্রবন্ধ লিখে। এ প্রবন্ধে সে কারিমুদ্দীনকে এক চোট গালাগাল শেষে এতটুকু লিখে যে, সে একজন নিম্ন শ্রেণীর মিথ্যাবাদী ও কমিনা ছিল। সাইয়েদ কারিমুদ্দীন দ্বিতীয় বার তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে। এ মামলার শুনানীর জন্য তাকে গুরুদাসপুর তলব করা হয়। আদালত তাকে পাঁচশত টাকা জরিমানার রায় প্রদান করে। মির্যা সাহেব অমৃতসরের আদালতে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে। যেহেতু সেখানের বিচারক ইংরেজ ছিলো এজন্য তিনি প্রথম আদালতের রায়কে পরিবর্তন করে মির্যা সাহেবকে নির্দোষ ঘোষণা দেন।

এরপর সে তার মতবাদ প্রচারে লাহোর ও শিয়ালকোট সদরে যায়। সেখানে তার বক্তব্য না শোনার আবেদন জানিয়ে ওলামাগণ জনগণের উদ্দেশ্যে ইশতেহার বিলি করেন। এ সফরে শুধুমাত্র একবারই তার বক্তৃতা করার সাহস হয়। জনগণ কঠোর বিরোধিতা করে এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে। যেহেতু এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে পুলিশের হেফাযতে এবং তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতো সেজন্য এ যাত্রা সে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং গাড়ীতে করে সোজা কাদিয়ান চলে যায়।

১৯০৫ সালে কাদিয়ান শহরে সে একটি আরবী ধর্মীয় মাদ্রাসা স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে তার মতবাদ প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরী করা। সে বছরই

সে দিল্লী গমন করে। দিল্লীর ওলামা তার মোকাবেলায় বেরিয়ে আসেন এবং তাঁরা তাকে কোথাও বক্তৃতা করার সুযোগ দেননি। অবশ্য যে বাড়ীতে সে অবস্থান গ্রহণ করে সেখানে কিছু লোক জড়ো করে বক্তৃতা দেয় ও তার মতবাদের মূলনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করে। এখানেও কিছু শ্রোতা তার বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাকে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়।

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অমৃতসরের একটি হলে বক্তৃতা করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ওলামায়ে কেরাম জনসাধারণকে তার বক্তৃতা শ্রবণ হতে বিরত থাকার আহবান জানান। মির্যা সাহেব যখন হলে উপস্থিত হয় এবং বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন একজন অনুসারী তার সামনে চায়ের পেয়ালা পেশ করে। অথচ সে জলসা রামাদান মাসে দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যখনই সে পেয়ালা মুখে স্পর্শ করে সাথে সাথে উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী শোরগোল আরম্ভ করে দেয়। তখন উত্তরে সে বলে, আমি মুসাফির এবং মুসাফিরদের জন্য রোযা ভাংগার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনি। এমন হাংগামার সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশের হেফাযতে হল ছেড়ে তখনি শহর থেকে পালিয়ে যেতে সে বাধ্য হয়।

১৯০৫ সালে সে দাবি করে, তার শেষ সময় আগত প্রায়। তখন সে কাদিয়ানীদের নিকট "ওসায়া" নামে পরিচিত বইটি রচনা করে। কিন্তু তার পরও সে তিন বৎসর জীবিত ছিল। তখন সে এও দাবি করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাকে একটি কবরস্থান তৈরীর নির্দেশ দে'য়া হয়েছে। অতএব যারা এ কবরস্থানে দাফন হতে ইচ্ছুক তারা যেন তাদের সম্পত্তির এক–চতুর্থাংশ দলীয় কোষাগারে জমা দেয়।

১৯০২ সালে পাঞ্জাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। তখন মির্যা গোলাম আহমাদ ইংরেজদের সমর্থন করে। সরকারের পক্ষে তার বিশ্বস্ততা প্রকাশার্থে সে একটি ইশতেহারও প্রচার করে। ইশতেহারে অনুসারীদেরকে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে বিশ্বস্ত থাকার এবং জাতীয় আন্দোলনকে স্তব্দ করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার নির্দেশ দেয়। আর তার অনুসারীরা তাই করে।

সে বছরই লাহোরে সব কয়টি মাযহাবের সম্মিলিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে প্রতিটি মাযহাবের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পড়ার জন্য মির্যা গোলাম আহমাদ একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠায়। একজন কাদিয়ানী তা পাঠ করার জন্য যখন প্রস্তুত হয় তখন অনেকেই উচ্চস্বরে হৈ চৈ শুরু করে।

১৯০৮ সালে সে লাহোর গমন করে। লাহোরে তার উপস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানগণ তার আগমনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যে বাড়ীতে তার অবস্থান ছিল সে বাড়ীর বাইরে মাঠে প্রতিদিন আলেমগণ সমবেত হয়ে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিতেন যে, এ ব্যক্তির সবগুলো দাবিই মিথ্যা। অতএব কেউ যেন তার ধোঁকায় না পড়ে।

মির্যা গোলাম আহমাদ কঠিন আমাশার রোগী ছিল। লাহোরে অবস্থানকালে তার এ রোগ আরও কঠিন আকার ধারণ করে। এরই জের হিসাবে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩২৬ হিজরীতে কলেরার প্রকোপে তার লীলাখেলা সাংগ হয়। তার লাশ কাদিয়ানে আনা হয় এবং সেখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়। পরে তার অনুসারীরা হাকিম নূরুদ্দীনকে তাদের মাযহাবের প্রথম খালীফা নির্বাচিত করে।
১৯১৪ সালে যখন নূরুদ্দীনের মৃত্যু হয় তখন এ মাযহাবের প্রবর্তক মির্যা গোলাম আহমাদের পুত্র বশীরুদ্দীন মাহমুদকে দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত করা হয়।

গোলাম আহমাদ কর্তৃক ওহী, নবুওয়াত ও রেসালাতের দাবি

মির্যা গোলাম আহমাদের দাবি ছিল, তার উপর ওহী নাযিল হয়। তার এলহামী খোৎবায় সে বলেঃ "এটাই হচ্ছে সে কিতাব যার একটি অংশ রাব্বুল এবাদের পক্ষ থেকে কোন একটি ঈদের দিনে আমার উপর ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়"।

তারপর সে বলেঃ "প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই আমার প্রভু আমার নিকট এ ওহী প্রেরণ করেনঃ

(أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا) .

অর্থাৎ "আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দেশানুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো"।

সাহাবায়ে কেরাম এবং সালফে সালিহীনের মধ্যে কেউ এ দাবি করেননি যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর ওহী নাযিল হয়। যদি মির্যা সাহেব শুধুমাত্র ওহী আসার দাবি করতো তাহলে আমরা বলতাম, হয়তো সে ওহী দ্বারা এলহাম বুঝিয়েছে। যেমনটি কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا)

অর্থাৎঃ "তোমার প্রভু মৌমাছির নিকট ওহীর মাধ্যমে এলহাম করেন যে, পাহাড়ে তোমরা ঘর বানাও"।

সে সময় শুধু এটাই দেখা হত তার উপর আগত এলহামের ধরন কি ছিল? যদি তা ধর্মীয় আয়াতসমূহ এবং আহকামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো তাহলে আমরা নিরবতা অবলম্বন করতাম। আর যদি উল্লেখিত কোন একটির পরিপন্থী হতো তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতাম এবং তা মানতে অস্বীকার করতাম। কিন্তু সে তো তার বইপত্রে পরিস্কার ভাষায় এবং বারবার এ ঘোষণা দেয়, আমি নবী এবং রাসূল। তার তথাকথিত "এলহামী খোৎবাতে সে বলে, "একটু চিন্তাও তো কর, সত্যিই যদি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকি এবং এর পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা আখ্যা দাও তাহলে হে মিথ্যা আখ্যাদানকারীগণ তোমাদের কি হাশরটাই না হবে"।

তারপর সে আরো বলেঃ "তোমরা দেখতে পাচ্ছ লোকেরা কিভাবে খৃষ্টান হচ্ছে এবং আল্লাহর দীন হতে ধর্মান্তরিত ও মূর্তাদ হয়ে যাচ্ছে। এরপরও কি তোমরা বলতে থাকবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রাসূল আসেনি? একটু চিন্তা করো, তোমরা এ কেমন ফায়সালা করছো"?

কিছুদূর পর সে লিখেঃ সুতরাং আল্লাহ এ উম্মত–অর্থাৎ ইসলামী উম্মাত–এর উপর এ নেয়ামত অবতীর্ণ করেন যে, তাদের মাঝে ঈসার বিকল্প প্রেরণ করেন। অন্ধরা ব্যতীত অন্য কেউ এরপরও কি অস্বীকার করতে পারে?

সে আরও বলেঃ "ঈসা বনী ইসরাইলের জন্য এলেম ছিল, আর হে জালেমরা আমি তোমাদের জন্য এলেম"।

তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে প্রচারকৃত একটি ইশতেহারের শিরোনাম ছিল "জামায়াতে আহমাদীয়ায় যোগদানের শর্তাবলী'। এতে সে লিখেঃ "মাসীহ মাওউদ অর্থাৎ স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমাদ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের অস্বীকার করা এতবড় দুঃসাহস যা (অস্বীকারকারীদেরকে) ঈমান হতেও বঞ্চিত করতে পারে"।

কাদিয়ানীদের এক প্রচারক আবুল আতা জলনধরী বলেঃ "আল্লাহ আহমাদের (গোলাম আহমাদ) সাথে সে সব মাাধ্যমে কথা বলেন যেগুলোর মাধ্যমে তিনি আম্বিয়াদের সাথে কথা বলেছিলেন। কেননা আম্বিয়াগণ নবুওয়াতের ব্যাপারে সমান।[৩]

কুরআন, সুন্নাহ ও এজমায়ে উম্মতের ধার না ধরে মির্যা গোলাম আহমাদ

(৩) ইসলামী আহমাদী খোশ খবরী দ্রষ্টব্য।

নবুওয়াত ও রেসালাতের দাবি করে। অথচ কুরআন, সুন্নাহ ও এজমায়ে উম্মত এ তিনটিতেই সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান যে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শেষ নবী এবং শেষ রাসূল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

(সূরা আহযাব/৪০)

অর্থাৎঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন্। তিনি তো আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।"

যদি خَاتَم (খা–তামুন) শব্দটি অন্য কিরাআত অনুযায়ী" ت (তা) কে জের দিয়ে অর্থাৎ" خَاتِم " (খা–তিমুন) পড়া হয় তাহলে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়াসাল্লামের একটি গুণ হবে। অর্থাৎ তিনি আম্বিয়াদের সিলসিলা সমাপ্ত করেছেন এবং তার পর অন্য কেউ নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না। এরপর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করবে সে একটি প্রমাণহীন জিনিসেরই দাবি করবে। " ت "(তা) র উপর জবর দিয়ে পড়লে অর্থাৎ ' خَاتَم ' (খা–তামুন) তবে তাও একই অর্থ প্রকাশ করে। এজন্য যে, خَاتَم (খা–তামুন) এবং خَاتِم (খা–তিমুন) শব্দদ্বয় একে অপরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কথাই অভিধানিক পন্ডিতেরা লিখেছেন। আর এ অর্থই তাফসীরের সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণ গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ হাদীছে এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আম্বিয়াগণ ইসরাঈলদের নেতৃত্ব দিতেন। একজন নবীর ইন্তেকালের পর অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন । কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না।

সহীহ হাদীছে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উদাহরণটি এমন, যেমন কোন ব্যক্তি প্রাসাদ তৈরী করে এবং অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ করে তৈরী করে। কিন্তু কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি থেকে যায়। মানুষ এ প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে আর তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাথে সাথে তারা এও বলতে থাকে যে, শেষটাতে এ জায়গায় ইট না দেওয়ার কারণ কি? (শুনে রাখ) আমিই হচ্ছি সেই ইট এবং আমিই হচ্ছি নবীদের সর্বশেষ নবী।

অর্থাৎ আমার আগমনের সাথে সাথে নবুওয়াতের প্রাসাদ পূর্ণতা লাভ করে। এখন এমন কোন স্থান আর বাকি নেই যা পূর্ণ করার জন্য অন্য কারো আসতে হবে"।

ইমাম আহমাদ তাঁর সনদের সাথে হযরত আবু তুফায়েল হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "আমার পরে কোন নবুওয়াত থাকবে না। শুধুমাত্র সুসংবাদ দানকারী বিষয়গুলো থাকবে। আবেদন করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল সুসংবাদ দানকারী বিষয়গুলো কি'? উত্তরে তিনি বলেন "ভাল স্বপ্ন অথবা সালেহ স্বপ্ন"।

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু অন্যান্য হাদীছ এবং সাহাবাগণের বেশ কিছু বাণী দ্বারা একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নবুওয়াত ও রেসালাতের পরম্পরা ও সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত পুরো উম্মতের এজমা হয়ে এসেছে এবং প্রতিটি মুসলমান সে শিক্ষিতই হোক বা অশিক্ষিত এ বিষয়টিকে দীনের বুনিয়াদী মূলনীতি গণ্য করে। এর স্বীকৃতি ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কুরআনের আয়াতে " خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ " শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাছীর বলেনঃ-

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুতাওয়াতির হাদীছে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। এটা এজন্য ঘোষণা করা হয়েছে যেন লোক জানতে পারে যে, পরে যে কোন ব্যক্তিই এ পদের দাবি করবে সে হবে নিকৃষ্টতম মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, দাজ্জাল এবং লোকদের ভ্রান্তপথ প্রদর্শনকারী।

ইমাম আলূসী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "রুহুল মাআনী"তে লিখেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়ার ঘোষণা কুরআন পাকে দে'য়া হয়েছে। হাদীছেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শেষ নবী। এর উপর পুরো উম্মতের এজমা প্রতিষ্ঠিত। অতএব যে ব্যক্তি এর পরিপন্থী কোন দাবি করবে তাকে কাফের ঘোষণা দে'য়া হবে।

কোন মুসলমানের পক্ষে কখনো এটা জায়েয নয় যে, সে কুরআন পাক ও বিশুদ্ধ হাদীছের এমন ব্যাখ্যা দিবে যা আল্লাহ এবং রাসূলের উদ্দেশ্য বিরোধী। এর দ্বারা যেন সে তার মনবাসনা চরিতার্থ এবং অন্তরে জেঁকে বসা মূর্তিটিকে শান্ত করতে পারে। আসুন, এখন দেখা যাক মির্যা গোলাম আহমাদ ও তার অনুসারীরা কুরআনের আয়াত

" وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ " ও এ সম্পর্কিত অকাট্য ও সুস্পষ্ট হাদীছসমূহের খেয়াল খুশীমত অপব্যাখ্যা করতি গিয়ে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করেছে। আর তাও শুধু এজন্যই যে, কাদিয়ান শহরের এক ব্যক্তি " هُدَى "-এর (হেদায়াত ও কল্যাণের উপর " هَوَى "র (মনগড়া) পথকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং সে দাবি করে বসে, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। অতঃপর প্রলাপ, ধোঁকা ও শঠতার মাধ্যমে কার্য সিদ্ধি করা, মিথ্যা বলা, এবং খোদাদ্রোহী শাসক গোষ্ঠীর জী হুজুরীতে সে তার সাধ্যমত কোন ত্রুটি করেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ "আমার পরে কোন নবী আসবে না"-এর ব্যাখ্যা সে ব্যক্তিটি এভাবে করেছে যে, তাঁর পরে কোন নবী তাঁর উম্মত বহির্ভূত অন্য কোন উম্মত হতে আসবে না।

আসলে হাদীছটির এমন হাস্যকর অপব্যাখ্যা আরেকজন মিথ্যা নবীর অনুকরণে করা হয়েছে। তার নাম "ইসহাক আখরাস"। (৪) সে আব্বাসী খলীফা সাফফাহের সময় আত্মপ্রকাশ করে। সে দাবি করেছিল যে, তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তারা তাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন। সে ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করে, কিন্তু আমি কিভাবে নবী হতে পারি, অথচ আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনিই সর্ব শেষনবী? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ সংবাদ দে'য়ার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে সব নবীদের পরম্পরা বা সিলসিলার শেষ নবী ছিলেন যারা তার উম্মাৎ এবং তার শরীআতপন্থী হবে না।

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে ওহীর সীমারেখা শুধুমাত্র তাদের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মের প্রবর্তক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ তারা এও দাবি করে যে, তাদের অনুসারীদের কাছেও ওহী প্রেরিত হয়। তাদের বর্তমান খলীফা একটি হ্যান্ডবিল প্রচার করে। আবদুল মজিদ কামেল নামক ব্যক্তি আরবীতে তা ভাষান্তর করে এবং মিসরে অনুবাদটি ছাপা হয়। তাতে লেখা ছিল, "জনসাধারণের জন্য ওহীর দরওয়াজা বন্ধ করে দে'য়া যেতে পারে না"। হ্যান্ডবিলের অন্য স্থানে এ কথাগুলো বর্তমান রয়েছেঃ

"ভারতে কাদিয়ান" নামক একটি শহরে মাহদী এবং মাসীহর আবির্ভাব ঘটেছে।

---

(৪) তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

তার অনুসারীদের মাঝে হাজারো ব্যক্তি এমন রয়েছে যারা আল্লাহর ওহী শুনতে পায়"।

গোলাম আহমাদ দাবি করে, তার উপর এই ওহী এসেছে যে,

وأني جاعلك للناس اماما ينصرك رجال نوحى إليهم

অর্থাৎ ঃ আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাতে চাই। এমন ব্যক্তিরা তোমার সহযোগিতা করবে যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাব।

আমাদের জানা নাই, এরা কোন মুখে ওহীর দাবি করে। অথচ যদি আপনি মির্যা গোলাম আহমাদের রচনাবলী এবং প্রচারপত্রগুলোতে দৃষ্টি বুলান তাহলে তাতে বিভিন্ন স্থানে এমন অর্থহীন ও বানোয়াট কথাবার্তা দেখতে পাবেন যার সাথে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই এবং যার মাঝে মিথ্যা পরিস্কারভাবে ধরা পড়ে। তার মাঝে পুরোপুরি চেষ্টার পর যদিও যুক্তিপূর্ণ কোন কথা দৃষ্টিগোচর হয়ও তবে এমন কথা তো আরো অনেকেই বলেছেন। বরঞ্চ এর চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ কথাও তারা বলেছেন। কিন্তু তাই বলে তো তাদের মনে কখনো এ আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়নি যে, এটা ওহী ছিল যা তার কাছে প্রেরিত হয়েছে অথবা তা নিয়ে তার কাছে রুহুল আমীন (জিবরাঈল) এসেছিলেন। মির্যা সাহেবের প্রলাপ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির অবস্থা তো এই যে, সে কুরআনের কিছু আয়াত অথবা কিছু বাক্য গ্রহণ করে। তারপর সেগুলোকে সে তার বইপত্রে কিছু রদবদলের মাধ্যমে দাবি করে বসে যে, এগুলো তার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে।

কাদিয়ানীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে। এ বিষয়ে তারা এমন কতগুলো কল্পিত ও মনগড়া সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে বিজ্ঞ ও পারদর্শী আলেমদের দৃষ্টিতে যার সামান্যতমও মূল্য নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তারা কুরআনের–

(اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ)

অর্থাৎ ঃ (আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে রাসূল (দূত) নির্বাচন করেন এবং মানুষদের মধ্যে হতেও) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। তাদের যুক্তির পুরো ভিত্তি হিসাবে আয়াতে উল্লেখিত يَصْطَفِيْ শব্দকে চিহ্নিত করে যা مضارع (মুদারে) র জন্য ব্যবহৃত। আর মুদারেতে ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলো বর্তমান কালের মত ভবিষ্যতের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এর জবাব হচ্ছে, কুরআন পাকে আরো কিছু জায়গা এমন আছে, যেখানে বালাগাতের উচ্চাংগ বর্ণনাভংগির দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতে কৃতকর্মের প্রকাশ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত (মুদারে) ক্রিয়া দ্বারা করা হয়েছে। এসব স্থানে বালাগাতের বেশ কয়েকটি ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সেগুলোর একটি হচ্ছে, এর দ্বারা অর্থে আশ্চর্য ও বিরলতা সৃষ্টি হয়। মুদারের ক্রিয়াগুলোতে বর্তমানের যে অর্থ রয়েছে উচ্চাংগের কথাবার্তায় অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী তার মাধ্যমে এমনভাবে অবতারণার জন্য ব্যবহৃত হয় যেন সে ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে বুঝান যায়। যেন যাদের উদ্দেশ্যে ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে তাদের আশ্চর্যে বিমূড়তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সে তখন চিন্তা বা কল্পনা করতে থাকে, বুঝি ঘটনাটি তারই সামনে ঘটছে এবং সে তা চাক্ষুস অবলোকন করছে।

এর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে কুরআন পাকের এ আয়াতটি ঃ

(إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ)

(অর্থাৎ ঃ আল্লাহর নিকট ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমেরই মত যে, আল্লাহ তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন অতপর তার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ হয়ে যাও, আর তিনি হতে থাকেন)। (এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে হয়ে যান)। এখানে মুদারের ক্রিয়া অর্থাৎঃ يَكُوْنُ ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ স্থানটি হচ্ছে অতীত ক্রিয়ার স্থান। কিন্তু যেহেতু পিতৃহীন কোন মানুষের সৃষ্টি তার স্বকীয়তায় অত্যাশ্চর্যজনক এবং বিরল ঘটনা, সেহেতু এমতাবস্থায় আরবী সাহিত্যে বালাগাতের (উচ্চাংগ বর্ণনা ভংগি) দাবি হচ্ছে তার বর্ণনা মুদারের ক্রিয়া দ্বারাই করা হোক। যেন এ ঘটনা যাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হচ্ছে তাদের মস্তিষ্কে পুরো ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র এমনভাবে পরিবেশিত হয় যাতে মনে হয় যেন তারা স্বচক্ষে তা সংঘটিত হতে দেখতে পাচ্ছে।

অতীতে সৃষ্ট ঘটনাবলী মুদারের ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনার মাঝে এ অর্থও পাওয়া যায় যে, তা অতীতে ক্রমাগত এবং বার বার হয়ে আসছে। এবং এটা বালাগাতের ঐ দিকটা প্রকাশ করে যা আরবী ভাষায় পারদর্শীগণ বালাগাত প্রকাশার্থে অধিকাংশ সময় ব্যবহার করে থাকেন। এর জন্য যদি অতীতের ক্রিয়াই ব্যবহৃত হয় তাহলে বালাগাতের এ দিকটি আর অবশিষ্ট থাকে না, বরঞ্চ তা শেষ হয়ে যাবে।

তারপর প্রথম আয়াত ঃ

(اللّٰهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ)

এতে অতীতে সংঘটিত ঘটনা মুদারের (অর্থাৎ এমন ক্রিয়া যার দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় কাল বুঝানো যায়) ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হয়। এতে মূল অর্থ 'নির্বাচিত করা' ছাড়াও অন্য আরেকটি অর্থ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে অতীতে নবী নির্বাচনের কাজ মাত্র একবার বা কয়েক বারই হয়নি, বরঞ্চ বার বার হয়েছে। এখন ঐ প্রমাণটি পেশ করা বাকি রইলো যা একথা ঘোষণা করে যে, উক্ত আয়াতে উল্লেখিত নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে, অতীতেও নির্বাচন হয়ে আসছে এটা বুঝানো হয়েছে। সে প্রমাণটি হলো কুরআনে পাকের আয়াত"। خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ এ ছাড়াও রয়েছে অগণিত মুতাওয়াতির হাদীছ যেগুলো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছে যে, নবুওয়াত ও রেসালাতের দ্বার এখন চিরতরের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আরবীতে পারদর্শীগণ মাদীর (অতীত ক্রিয়া) স্থানে মুদারের ক্রিয়া এত বেশি ব্যবহার করেছেন যার গণনা ও হিসাব করা অসম্ভব। তারপর কুরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত করে থাকে। অনুরূপভাবে হাদীছও কুরআনের ব্যাখ্যা করে থাকে।

মির্যা গোলাম আহমাদের দাবি হচ্ছে, সে রাসূল। হাদীছে মারয়ামপুত্র (ঈসা আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার মতে সন্দেহাতীতভাবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বয়ং সে নিজে। এজন্য সে হাদীছের শব্দগুলির অত্যন্ত বিকৃত ও নিকৃষ্ট ব্যাখ্যা শুরু করে। তারপর একটু অগ্রসর হয়ে সে তার তথাকথিত "এলহামী খোতবা"তে স্বীয় অনুসারীদেরকে হাদীছে নববীর আলোকে আমল করা হতে রুখে দেয়। কুরআন পাকের অনেকগুলো আয়াতের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সে নিজ দাবির সমর্থনে তা ব্যবহারের অপচেষ্টা চালায় এভাবে যে, তার (মির্যা গোলাম আহমাদ) আবির্ভাবের ঘোষণা এবং তা প্রচারের জন্য এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা তাহরীমের এ আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে।

(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا)

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ ঈমানদারদের ব্যাপারে ইমরান তনয়া মারয়ামের উদাহরণ পেশ করছেন। যিনি তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছিলেন। অতঃপর আমরা তার মাঝে নিজেদের পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দেই।"

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মির্যা গোলাম আহমাদ বলে ঃ আয়াতে একথার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান জাতির মধ্য হতে মারয়াম সিদ্দীকার সমকক্ষ একজন লোকের আবির্ভাব হবে। অতঃপর সে লোকটির মাঝে ঈসার রুহ ফুঁকে দে'য়া হবে। এতে মারয়াম হতে ঈসার আবির্ভাব হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তিটি স্বীয় মারয়ামী বৈশিষ্ট্য হতে ঈসায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত হবে। মনে হয় যেন তার মারয়াম হওয়ার বৈশিষ্ট্য ঈসা হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে জন্ম দিল। আর এ অর্থেই তাকে মারয়াম পুত্র বলা হবে"।

এখানে আমরা তার প্রলাপ ও অর্থহীন কথাবার্তা এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করতে চাই না। তবে সামনে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এ বাতিল সম্প্রদায়ের আরো কিছু উদ্ভট প্রলাপ উল্লেখ করা হবে।

গোলাম আহমাদ তো নবুওয়াত ও রেসালাতের দাবি করে বসল। কিন্তু সর্বদাই সে তার ব্যর্থতা অনুভব করতে লাগল। এমনকি সাধারণ মানুষ যারা অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এজন্য তৈরি ছিল না যে, ইসলাম ছেড়ে দিয়ে এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করবে যে ধর্মের প্রবর্তক বলে, আমি ইসলামী শরীয়তকে বাতিল করে দিয়েছি। সে তাদেরকে নিজের ধোঁকায় আকৃষ্ট করতে না পারায় সবসময় ভীত ছিল। অতএব সে তার তথাকথিত "এলহামী" খোৎবাতে বলে ঃ

"লোকেরা বলে যে, আমাদের না মাসীহর প্রয়োজন আছে না মাহদীর। আমাদের জন্য তো কুরআনই যথেষ্ট এবং আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত। তারা জানে যে, কুরআন শুধু পবিত্র ব্যক্তিরাই ছুঁতে পারে। সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এমন একজন বুদ্ধিমান মুফাসসিরের প্রয়োজন ছিল যার সাথে আল্লাহর সমর্থন থাকবে এবং বিবেকসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শীদের মধ্যে সে গণ্য হবে"।

এ সব কথার উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত সাধারণ জনগণকে তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। একদিকে এ সব বক্তব্যের মাধ্যমে সে স্বীয় আকাংখা চরিতার্থের প্রত্যাশী ছিল। অন্যদিকে একথাও তার ভাল করেই জানা ছিল যে, কুরআন ও হাদীছে এমন কথার কোন স্থান নেই। এ কারণে প্রথমে সে শরীআতের উৎস হিসাবে হাদীছকে রদ করার অপচেষ্টা চালায় এবং এরপর কুরআনের অপব্যাখ্যা ও মনগড়া অর্থের হুবহু সে পথটি অনুসরণ করে যা ইতিপূর্বে বাতেনীরা অনুসরণ করেছিল। এখন তার এ দাবি করার আর কোনই প্রয়োজন ছিল না যে, সে আলাদা কোন ধর্ম নিয়ে এসেছে। কেননা তার এবং তার অনুসারীদের সামনে এমন কোন বাধা ছিল না যা তাদেরকে নিজেদের

ইচ্ছানুযায়ী মনগড়া প্রলাপ বকা হতে বিরত রাখবে। যদি তাদেরকে বলা হয়, আপনাদের অমুক কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক হাদীছের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তখন তারা সে হাদীছটির যথার্থতাই অস্বীকার করত অথবা তার অপব্যাখ্যার জন্য ধোঁকা ও বানোয়াটের সেই পথের আশ্রয় নিত যা ইতিপূর্বে বাতেনীরা অনুসরণকরেছিল।

মুজেযা ও অলৌকিক প্রমাণাদির দাবি

মির্যা গোলাম আহমাদ তার "এলহামী খোতবা"তে বলে ঃ "যদি তোমরা আমার সত্যতার প্রমাণাদির ফিরিস্তি তৈরি করতে চাও তাহলে তা পারবে না"। অথচ আমরা তার অগণিত প্রমাণাদির মাঝে একটি ছাড়া দ্বিতীয়টি পাই না। আর যেটা পাওয়া যায় তা হলো, তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং তাতে তাকে নির্দোষ বলা হয়। আর তাও ইংরেজ বিচারকদের ফায়সালার আলোকেই সম্ভব হয়েছিল। অথবা এটা পাওয়া যায় যে, বেশ কয়েক বারই বিক্ষুব্ধ জনতার কবল থেকে সে রেহাই পায়। আর তাও শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী তাকে নিজেদের বেষ্টনীতে হেফাযতে রাখত বলেই সম্ভব হত।

তার সত্যতার একটি প্রমাণ সে এও বলে যে, তার তাবলীগ স্বার্থপর পথভ্রষ্ট ও অজ্ঞ কিছু লোককে আকৃষ্ট করেছে। সুতরাং সে তার "খোৎবায়ে এলহামিয়া"তে বলেঃ "যদি আমাদের তাবলীগের সিলসিলা আল্লাহর পক্ষ থেকে না হত তাহলে তার মুখোশ খুলে যেত এবং আমাদের উপর আসমান ও যমীনের লা'নত পড়ত। আর আল্লাহ আমার শত্রুদের ইচ্ছাকে সফল করে দিতেন"।

সে তার তাবলীগের মত তার মিথ্যা দাবিগুলো মেনে নেয়ার জন্য কিছু লোক পেয়েও যায় যাদের অন্তরে মূর্খতা এবং গোমরাহী অনেক পূর্বেই বাসা বেঁধেছিল। এ জন্য নবুওয়াত ও রেসালাতের মর্যাদা অনুভব করা এবং তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। এবং এও তাদের জন্য অসম্ভব ছিল যে, তারা সত্য ও মিথ্যার দাবিদারদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। কিছু লোকের নিকট কতিপয় মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাকে যদি তাদের সত্য হওয়ার দলীল মনে করা হয়, তাহলে বাহায়ীদের মত বাতিল ফেরকাকে একটি সত্য মাযহাব স্বীকার করতে হবে। অথচ তাদেরকে মুসলমানগণ এমনকি কাদিয়ানীরাও বাতিল মাযহাব বলে ঘোষণা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হলো, সব সময়ই বাতিল শক্তি তার ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের

জন্য কিছু না কিছু সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু যখনি ওলামায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞ ও শিক্ষিত সুধীমন্ডলী হক বিরোধীদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন এবং এজন্য সঠিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন তখন বাতিল পিছুটান দেয়। এরপর তা হয়ত আদতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা তা হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার সুযোগ দিয়ে রাখার মধ্যেই আল্লাহ তাআলার অনেক বড় হেকমত নিহিত থাকে।

মির্যা গোলাম আহমাদ তার বইপত্রে "মুবাহালার" উল্লেখ করে। তার দাবি হচ্ছে, যখনি আমার এবং আমার কিছু শত্রুদের মাঝে মুবাহালা অনুষ্ঠিত হবে তখনি তাদের পরাজয় হবে এবং জয় হবে আমার। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা এ পদ্ধতি মাওলানা আবুল ওয়াফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর উপর পরীক্ষা করে দেখতে চায়। আর তখনি তাদের মুবাহালার আসল রহস্য ভেদ হয় এবং তারা যে মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ এটা তার জীবন্ত ও জলন্ত প্রমাণে পরিণত হয়। কিন্তু এটাকে কি করা যেতে পারে যে, বাতিল পূজারীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের কর্ণকুহরে আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তারা শ্রবনশক্তি হতে বঞ্চিত।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী যখন মির্যা সাহেবের বিভিন্ন দাবির অপরিপক্কতার মুখোশ খুলতে আরম্ভ করেন তখন মির্যা সাহেবের মগজ টগবগ করে ফুটতে শুরু করে। কিছুদিন তো প্রতিউত্তর দিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মাওলানার দূরদর্শী জ্ঞানের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং তাঁর লা জওয়াব সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তখন সে একটি হ্যান্ডবিল প্রচার করে। এতে আল্লাহর নিকট সে শেষ প্রার্থনা জানায় এবং মাওলানাকে উদ্দেশ্য করে লিখে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

يستنبئونك أحق هو اى والله انه لحق

বখেদমতে জনাব মৌলভী ছানাউল্লাহ সাহেব। যারা সত্যের অনুসারী তাদের উপর সালাম।

সব সময়ই আপনি আপনার পত্রিকা (আহলে হাদীছে) আমাকে মারদূদ, কাযযাব, দাজ্জাল ও মুফসেদ নামে আখ্যায়িত করে আসছেন। আমি আপনার পক্ষ থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছি এবং তা সহ্য করে আসছি...। সত্যিই যদি আমি সে রকম কাযযাব ও ভাওতাবাজ হয়ে থাকি যেভাবে আপনি আপনার পত্রিকায় আমাকে স্মরণ করে

থাকেন, তাহলে আমি আপনার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হয়ে যাব। কেননা আমি জানি, ফেৎনাবাজ এবং মিথ্যাবাদীরা অনেক দিন বেঁচে থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত সে অপদস্ত ও অপমানের সাথে তার চির শত্রুদের জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ এবং ধ্বংস হয়ে যায়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, হে আমার মালিক, সবকিছু অবলোকনকারী সর্বশক্তিমান, যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্ববিষয় অবগত, মাসীহ মাওউদ হওয়ার দাবিটি যদি স্রেফ আমার নফসের বানোয়াট হয় এবং আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে ফেৎনাবাজ ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে হে আমার প্রিয় মালিক, আমি বিনয়ের সাথে তোমার দরবারে আবেদন করছি, মৌলভী ছানাউল্লাহর জীবদ্দশাতেই আমায় ধ্বংস করে দাও। কিন্তু হে আমার সার্বভৌম এবং সত্য আল্লাহ, মৌলবী ছানাউল্লাহ আমাকে যে সমস্ত অপবাদ দিচ্ছে সেগুলো যদি না হক হয় তাহলে আমি বিনীতভাবে তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি, আমার জীবিত অবস্থাতেই তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও। তবে সে ধ্বংস লীলা যেন মানুষের হাতে না হয়। বরঞ্চ তা যেন প্লেগ ও কলেরা ইত্যাদি প্রাণহরণকারী রোগের দ্বারা হয়। আমি তোমারই পবিত্রতা এবং রহমতের দামান ধরে তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি, আমার এবং ছানাউল্লাহর মাঝে সঠিক ফায়সালা করে দাও এবং যে ব্যক্তি তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত অরাজক এবং কাযযাব তাকে যে সত্যপন্থী তার জীবদ্দশাতেই পৃথিবী থেকে তুলে নাও এবং মৃত্যুতুল্য কঠিন বিপদে তাকে নিক্ষেপ কর। হে আমার প্রিয় মালিক! তুমি এমনটিই কর। আমীন, ছুম্মা আমীন।

(লেখক, আবদুল্লাহিস সামাদ, মির্যা গোলাম আহমাদ, মাসীহ মাওউদ–আফাহুল্লাহু ওয়া আইয়াদাহু। ১লা রবিউল আওয়াল, ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৫ এপ্রিল, ১৯০৭ ইংরেজী)।

মির্যা সাহেবের দোয়াটি এভাবে কবুল হয় যে, মাত্র এক বৎসর পরই ২৬শে মে ১৯০৮ সনে তার মৃত্যু হয় (এবং তাও কলেরার শিকার হয়ে, যার উল্লেখ সে তার দোয়া নামায় মিথ্যাবাদীর আলামত হিসাবে উল্লেখ করেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই সে মাওলানা ছানাউল্লাহ সাহেবের জন্যই তা আশা করেছিল।[১]

মাওলানা ছানাউল্লাহ এখনো সহীহ সালামতে জীবিত আছেন এবং পবিত্র দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন এবং কাদিয়ানী তল্পিবাহকদের ধোঁকা ও ভাওতা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করছেন।[২]

---

(১) আরবী হতে উর্দুতে অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

(২) লেখকের এ প্রবন্ধ সম্ভবত ১৯৪৮ সালের পূর্বেকার ছিল, কেননা তখন পর্যন্ত মাওলানা সানাউল্লাহ আসলেই জীবিত এবং সুস্থাবস্থায় ছিলেন এবং পবিত্র দীনের খেদমতে রত ছিলেন।

মির্যা সাহেব অবগত ছিলেন যে, তার কাছে নবুওয়াতের না কোন প্রমাণ আছে আর না দলীল বলা যেতে পারে এমন কোন জিনিস আছে। পাঞ্জাবে যখন একবার প্লেগ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় তখন সে সেটাকে সরলমনা এবং অশিক্ষিত মানুষকে তার ফাঁদে ফেলবার একটা মোক্ষম উপায় মনে করে দাবি করে বসে যে, তার উপর ওহী এসেছে, "এ প্লেগের প্রকোপ থেকে শুধু তারাই রেহাই পাবে যারা এখলাসের সাথে ও আন্তরিকভাবে তার উপর ঈমান রাখবে। কমপক্ষে তাকে কষ্ট দেয়া এবং ভালোমন্দ বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বান্তকরণে তার মর্যাদা স্বীকার করে নেবে"।(১)

এ দাবির পেছনে কারণ ছিল সরল ও নির্বোধ কিছু লোককে দলে ভেড়ানো যাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষার দাবিদার যে কোন ব্যক্তির হুশিয়ারীতে তারা ভীত হয়ে পড়ে।

وَإِنْ يَعِدُهُمْ إِلاَّ غُرُوْرًا

অর্থাৎঃ আসলে তারা শুধু ধোঁকারই ওয়াদা করে।

মির্যা সাহেবের আত্মম্ভরিতা এবং কিছু মহাসম্মানিত আম্বীয়া হতে তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি

মির্যা সাহেব আত্মম্ভরিতায় এত বেশী ভূগৃছিল যে, সে নিজেই তার জন্য অত্যন্ত উচ্চাংগের উপাধি তৈরী করে তা প্রচার করতঃ তার বই "ইস্তিফতা"–তে দাবি করে যে, আল্লাহ তাকে এভাবে সম্বোধন করেনঃ–

أنت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى انت منى بمنزلة عرشى انت منى بمنزلة ولدى

অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার একত্বতা ও অতুলনীয়তার সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার আরশের সমতুল্য। আমার কাছে তোমার স্থান হচ্ছে আমার ছেলের মত।

আরবীতে প্রকাশিত একটি বই "আহমাদ রাসূলুল আলাম আল মাওউদ" এতে

মাওলানার মৃত্যু ১৯৪৮ সন অর্থাৎ মির্যার অকাল মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর হয়। কাদ্দাসাল্লাহ সিররাহ। [অনুবাদক, আরবী থেকে উর্দু।

(১) দেখুন কাদিয়ানী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত, "তালীমাতে মাসীহ মাওউদ"।

একটি রচনা রয়েছে। সেখানে সে বলেঃ "আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, ইসলামী সিলসিলার মাসীহ মূছাবী সিলসিলার মাসীহ হতে অনেক মর্যাদাশীল"। ইসলামী সিলসিলার মাসীহ দ্বারা সে নিজেকে বুঝায়। তার দাবি হল, সে ঈসা আলাইহিস সালাম হতে শ্রেষ্ঠ। সে এও দাবি করেছে যে, আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ "আমি তোমাকে ঈসার উৎস হতে সৃষ্টি করেছি। তুমি এবং ঈসা একই উৎস হতে সৃষ্ট এবং তোমরা উভয় একই জিনিসের মত"।(১)

ঘটনাক্রমে কাদিয়ানীদের অন্য আর একটি বই দেখার সুযোগ হয়। বইটি কোন এক কাদিয়ানী আরবীতে ভাষান্তর করেছিল। সেখানে মির্যা সাহেব ওহী সম্পর্কে আলোচনা করে এবং ওহীর এমন একটি স্তর বর্ণনা করে যে স্তরে আল্লাহ বান্দাদের সাথে কথোপকথন করেন ও তার অন্তর থেকে কথা বলেন এবং বান্দার হৃদয়কে তার আরশে পরিণত করেন। সাথে সাথে তাকে সে সব নেয়ামতও প্রদান করেন যা তিনি পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন"। কিছুদূর পর সে আরো লিখেঃ এখনো যদি আমি এ ঘোষণা না দেই তাহলে স্বজাতিদের উপর জুলুম হবে। ঘোষণাটি হল, "আমি সেই আধ্যাত্মিক মকাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছি যার বর্ণনা আমি এখানে করেছি। আল্লাহ আমাকে মুখোমুখি কথাবার্তার সে মর্যাদা দান করেছেন যা আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি"।

মাওলানা ছানাউল্লাহ গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উর্দু ও ফার্সী বইসমূহ থেকে তার বহু বক্তব্যের উদ্বৃতি দেন। এক স্থানে মির্যা সাহেব বলেঃ "মারয়াম পুত্রকে ত্যাগ কর। কেননা গোলাম আহমাদ তার চেয়েও অনেক উত্তম"। অন্য এক স্থানে সে বলে– "আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথক পৃথকভাবে দান করেছেন তার সবগুলো আমাকে একসাথে দিয়েছেন"। অন্যত্র তার ভাষ্য হচ্ছে, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তোমার মর্যাদা তো হচ্ছে এমন যে,যখনি তুমি কোন জিনিসকে উদ্দেশ্য করে বল, হয়ে যা, তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়"। আসলে কথা হল, মির্যা সাহবের বইপত্র এ ধরনের প্রলাপ ও উদ্ভট বক্তব্যে পরিপূর্ণ।

বিরোধীদের প্রতি মির্যা সাহেবের কুফরী ফাতওয়া

মুসলমানদের মধ্যে যারা তার দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় মির্যা সাহেব তাদের সবাইকে কাফের বলে এবং তাদেরকে ইহুদীদের সাথে তুলনা করে। তার তথাকথিত "এলহামী খোৎবা"য় সে বলেঃ আমাদের নবী মুস্তাফা মূছার সমপর্যায়ের

---

(১) হামামাতুল বুশরা।

ছিলেন। ইসলামী খেলাফতের সিলসিলা কালীম (মূছা) আলাইহিস সালামের খেলাফাতের মত ছিল। এ সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের অবশ্যম্ভাবী দাবি ছিল যে, ইসলামী সিলসিলার শেষভাগে মূছাবী সিলসিলার মাসীহর মত একজন মাসীহর আবির্ভাব হোক। ইহুদীদের মধ্যে যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে কাফের ও মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল ইসলামেও তাদের মত ইহুদীদের আবির্ভাব ঘটুক"। তার বিভিন্ন বিবৃতিতে সে বার বার স্বয়ং নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এবং তাকে অস্বীকারকারীদেরকে ইহুদীদের সাথে তুলনা করে।

"আহমাদীয়াতে যোগদানের শর্তাবলী" নামক একটি ছোট পুস্তিকায় কাদিয়ানীরা পরিস্কারভাবে বলেছেঃ যে সমস্ত মুসলমান আহমাদকে মিথ্যা মনে করে তারা মুনাফিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার লিখা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

"আর এভাবেই কোন আহমাদীর জন্য কোন আহমাদীর জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ জায়েয নয়। কেননা জানাযায় অংশগ্রহণ করে সে যেন আল্লাহর দরবারে এমন এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করল যে আজীবন মাসীহর বিরোধিতা করেই মৃত্যুবরণ করল। অথচ আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া যাবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দেয়?"

মির্যা সাহেব মুসলমানদের সম্পর্কে বার বার মন্তব্য করেছেন যে, মুসলমান তার মাযহাবের শত্রুদেরও শত্রু। তার একটি রচনায় সে অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেঃ

"শুনে রাখ! ইংরেজ সরকার তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ। তোমাদের জন্য বরকত তুল্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমরা মনে প্রাণে এ ঢালের সম্মান দাও। আমাদের বিরোধী মুসলমানদের তুলনায় ইংরেজরা হাজার গুণে ভাল"।(১)

গোলাম আহমাদ জানত, একমাত্র আলেমরাই তার আসল রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত বিধায় তাঁরাই তার আসল চেহারা প্রকাশ করতে পারবেন এবং জনসাধারণকে এ ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানাতে পারেন। এজন্য সে আলেমদেরকেই সব চেয়ে বেশী গালমন্দ বলতে থাকে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের জন্য অনুসারীদের উস্কানী দিতে থাকে।

"মাসীহ মাওউদের শিক্ষা" নামক একটি বইয়ে সে বলেঃ "আমি আমার সমস্ত

---

(১) কথাগুলো কাদিয়ানীদের আরবীতে প্রকাশিত "আহমাদ রাসূলুল আলাম আল-মাওউদ" থেকে গৃহীত।

অনুসারীকে উপদেশ দিচ্ছি, যে সমস্ত মৌলবী ধর্মীয় পোশাকে মানুষের রক্ত প্লাবিত করছে এবং তাকওয়া নামক পর্দার অন্তরালে থেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পাপে লিপ্ত রয়েছে তাদের সাথে কঠোর বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করবে। আমার অনুসারীদের জন্য ফরয, তারা যেন বৃটিশ সরকারকে সম্মান করে ও তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং তাদেরকে স্বীয় বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের ওয়াদা দেয়"।

"শেষ যামানার মেকি রাসূল" গোলাম আহমাদ মুসলমান হতে দূরে সরে থাকা ও বিচ্ছিন্ন হওয়াটাকে একটি নেয়ামত মনে করে যা চিন্তার বিষয়। বার্লিন থেকে ডক্টর জ্যাকি কেরাম জাভার একটি পত্রিকা "হাজারা মাওত"–এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান। ১৩৫১ হিজরীর ৮ মুহাররম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে তিনি লিখেন যে, কাদিয়ানীরা বার্লিনে যে মসজিদটি নির্মাণ করে আমি ও আমীর শাকীব আরসিলান সে মাসজিদের ইমাম সাহেবর সাথে দেখা করতে গেলাম। ইমাম সাহেব আমাদেরকে মির্যা গোলাম আহমাদের একটি বই দেখান। তা থেকে আমীর শাকীব আরসলান কিছু বাক্য নোট করে নেন। সেগুলোর একটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সে অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমাদ এ ব্যাপারে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে যে, সে ইংরেজদের পতাকাতলে এবং মুসলমান হতে অনেক দূরে জন্মগ্রহণ করে"।

কাদিয়ানীদের দু'টি দল

মির্যা গোলাম আহমাদ ও তার খলীফা হাকিম নূরুদ্দীনের সময় পর্যন্ত কাদিয়ানীদের একটিই মাযহাব ছিল। কিন্তু হাকিম নূরুদ্দীনের শেষ দিনগুলোতে তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। সুতরাং যখন নূরুদ্দীনের মৃত্যু হয় তখন তারা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল "কাদিয়ানে"ই ছিল। দলটির নেতৃত্বে ছিল মির্যা গোলাম আহমাদের পুত্র মির্যা মাহমুদ। দ্বিতীয় দলটি লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজীতে কুরআন পাকের অনুবাদক ও প্রচারক মুহাম্মাদ আলী এ দলের নেতা হয়। 'কাদিয়ানের' গ্রুপটি তার পূর্ব আকীদাতেই অটল ছিল। আর তা ছিল মির্যা গোলাম আহমাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন। কিন্তু "লাহোরী" গ্রুপটি তাদের মূল আকীদা ঘোষণা করে যে, মির্যা গোলাম আহমাদ রাসূল বা নবী ছিল না। কিন্তু এটা কিভাবে সংশোধন করা যাবে যেখানে মির্যা গোলাম আহমাদের বইপত্র তার নবুওয়াত ও রেসালাতের দাবিতে পরিপূর্ণ রয়েছে?

লাহোরী গ্রুপও অনেকগুলো ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। সেগুলো তাদের প্রচারিত বই

পত্রের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। যেমন ঈসা আলাইহিস সালামের পিতা ছাড়া জন্ম গ্রহণকে তারা অস্বীকার করে। মুহাম্মাদ আলী স্পষ্ট বলে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইউসুফ নাজ্জারের পুত্র ছিলেন (নাইজুবিল্লাহ। এজন্য তারা কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের এমন ব্যাখ্যা দেয় যেন তার ভিত্তিতে তাদের আকীদা সঠিক প্রমাণিত হতে পারে।(১)

এ লাহোরী গ্রুপটি ওকিং (লন্ডন) থেকে "ইসলামি রিভিউ" নামে ইংরাজী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। একবার তাতে ডক্টর মার্কোসের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে সে বলে, "মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, ইউসুফ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পিতা ছিল"। এ সম্পর্কে সম্পাদকের পক্ষ থেকে কান মন্তব্য করা হয়নি। কেননা ডক্টর মার্কোসের এ উক্তি হুবহু তাদের আকীদানুযায়ী ছিল।

এভাবে মুহাম্মাদ আলী তার অনূদিত কুরআনে শাব্দিক অর্থ অবলম্বন করে। কিন্তু টিকাতে সে আকীদানুযায়ী শাব্দিক অর্থের ব্যাখ্যা করে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা আল ইমরানের এ আয়াতটি ঃ

(أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّٰهِ)

পেশ করা যেতে পারে । মুজেযা অস্বীকারকারীদের মত সেও এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে। কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে এমন কৌশল অবলম্বন করে যাতে কখনও একথা বুঝে আসে না যে, কুরআন পাক আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কাদিয়ানীদের বিরোধিতা করা এবং সাধারণ মুসলমানকে তাদের ফেৎনা থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা

কাদিয়ানীরা তাদের মতবাদ প্রচারে অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করে। যেহেতু তাদের মাযহাবের ভিত্তি ইসলামেরই কিছু শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত সেজন্য তারা অত্যন্ত সহজভাবে দাবি করে বসে যে, তারা ইসলামেরই প্রচার করছে। বিশেষ করে "লাহোরীদের" জন্য এটা দাবি করাত এমনিতেই সহজ। কেননা তারা দাবি করে মির্যা গোলাম আহমাদ নবী নন্। বরঞ্চ তিনি এক জন মুসলেহ ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। সুতরাং যারা এ মতবাদের আসল রহস্য সম্পর্কে অবগত নন্ তারা ভুলে পতিত হন

---

(১) দেখুন তারই বই আরবী ভাষায়, ঈসা ও মুহাম্মাদ ' পৃষ্ঠা–৮।

যে, বোধ হয় এ লোকগুলো আসলে ইসলামেরই প্রচার করছে। এজন্য অনেক সময় তারা তাদের সাথে সহযোগিতা করে এবং যারা জনসাধারণকে এদের ধোঁকা ও ভাওতা থেকে মুক্ত রাখতে চায় তাদের সমালোচনা করে। যদি এরা তাদের প্রচারকার্য অমুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত তাহলে তেমন আশংকার কারণ ছিল না। তখন তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের প্রতিরোধের চিন্তা ভাবনা করতাম। কিন্তু বিপদ হ'ল এখানে যে, তারা তাদের দাওয়াতের লক্ষ্যবস্তু বিশেষভাবে মুসলমানদের সেই স্তরকেই নির্ধারিত করেছে যারা কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং কুরআন ও হাদীছকেই তাদের জীবনে চলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে। কাদিয়ানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ স্তরেই বিশেষভাবে গোলাম আহমাদের রেসালাতের আকীদা প্রচার করা হোক। সুতরাং তারা মিসর, শাম, ফিলিস্তীন, জেদ্দা, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে তাদের প্রচারক প্রেরণ করে। দুঃখের বিষয় হলো, অনেক যুবক যাদের পিতামাতা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি তারা এদের ফাঁদে পড়ে যায়।

কাদিয়ানীরা লোকদের কাছে বলে বেড়ায়, চীন, ভারত, ইরান, ইরাক, জেদ্দা, শাম, ফিলিস্তীন ও মিসর এ সমস্ত জায়গায় তাদের মুবাল্লিগরা কাজ করছে। ১৯৩২ সালে তাদের প্রকাশিত একটি বই-এ আমরা পড়েছি যে, মিসরে তাদের মোবাল্লিগ শাইখ মাহমুদ আহমাদ কায়রোর অমুক সড়কে অবস্থান করেন।

আপনারা দেখেছেন ভারতের আলেমগণ এ বাতিল গোষ্ঠীর কিরূপ বিরোধিতা করেছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আমরা আনন্দিত যে, শামের কিছু আলেমও তাঁদের সহযোগিতা করছেন। সুতরাং তাঁরা কাদিয়ানীদের জবাবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ অবগত করানোর জন্য বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছেন। এগুলোতে বলা হয়েছে। কিভাবে তারা কাদিয়ানীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবেকে উদিত সূর্যের পূজা এবং সকল ইসলাম বিরোধী শক্তির এজেন্টগিরী শুরু করে।

আমরা প্রবন্ধটি এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি যেন মিসরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের জনসাধারণকে বাহাইদের মত এ বাতিল গোষ্ঠীর ফেৎনা থেকে বাঁচানো যায়। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করি আমাদের ওলামায়ে কেরাম এবং ওয়ায়েযীনগণ এই বাতিল গোষ্ঠীর প্রচারকদের দাঁতভাংগা জবাব দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের পক্ষ থেকে উথাপিত বিভিন্ন সন্দেহ, সংশয়, অপপ্রচার ও কুধারণা সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করার যে অপচেষ্টায় তারা লিপ্ত তা দূরীকরণের বাস্তব প্রচেষ্টা চালাবেন।